#RiseWithRICE

RICE IAS

প্রত্যাশিত
EDITORIAL EXPLAINED

for

IAS মেইনস পরীক্ষা

06th April to 11th April 2026

সূচক

1. **সাধারণ অধ্যয়ন ২** ______ **01**
    1.1. রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থা ______ 01
        1.1.1. ভারতের উচ্চশিক্ষার ভিত্তি হিসেবে বৃত্তির পুনর্কল্পনা ______ 01
        1.1.2. নির্বাচনী প্রাণবন্ততা: ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোয় উচ্চ ভোটার উপস্থিতির বিশ্লেষণ ______ 06
        1.1.3. সীমাহীন নির্বাহী ক্ষমতা: প্রধানমন্ত্রী পদের মেয়াদ বিতর্ক ______ 09
        1.1.4. পরিচয়ের বিবর্তন: ‘কেরল’ থেকে ‘কেরলম’ নামকরণের ব্যবচ্ছেদ ______ 13
        1.1.5. ভারতে হেপাজতি সহিংসতা (CUSTODIAL VIOLENCE): এক পদ্ধতিগত বিচার ______ 17

2. **সাধারণ অধ্যয়ন ৩** ______ **21**
    2.1. অর্থনীতি ______ 21
        2.1.1. ভারতের টেক্সটাইল খাতের অগ্রগতিতে তাপপ্রবাহের সংকট ______ 21

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | **IAS 10-Month GS PCM** | **Degree + IAS** | **Prelims Test Series**

সাধারণ অধ্যয়ন ২

1.1. রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থা

1.1.1. ভারতের উচ্চশিক্ষার ভিত্তি হিসেবে বৃত্তির পুনর্কল্পনা

ভূমিকা

- **জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP) ২০২০**-এর লক্ষ্য অনুযায়ী ভারত ২০৩৫ সালের মধ্যে উচ্চশিক্ষায় **৫০% গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও (GER)** অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। তবে প্রকৃত চ্যালেঞ্জ কেবল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ানো নয়, বরং ছাত্রছাত্রীরা যাতে মর্যাদার সাথে শিক্ষা **গ্রহণ (Access)**, **ব্যয়ভার বহন (Afford)** এবং শিক্ষা **সম্পন্ন (Complete)** করতে পারে তা নিশ্চিত করা।
- এই প্রেক্ষাপটে, **বৃত্তি (Scholarships)** একটি **পরিবর্তনকারী হাতিয়ার** হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে—যা **সাম্য (Equity)**, **গুণমান (Quality)** এবং **জাতীয় প্রবৃদ্ধিকে (Growth)** সংযুক্ত করে। এটি কেবল নির্ধারণ করে না কে উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ করবে, বরং এটিও নিশ্চিত করে যে কে তার মধ্যে **সাফল্য (Thrive)** অর্জন করবে।

ভারতের উচ্চশিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি

ভারত তার উচ্চশিক্ষার পরিকাঠামো বিস্তারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে।

- **প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি:** ইকোনমিক সার্ভে অনুযায়ী, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২০১৪-১৫ সালের ৫১,৫৩৪ থেকে বেড়ে ২০২৫-২৬ সালে **৭০,০০০-এর বেশি** হয়েছে।
- **ছাত্র নথিভুক্তি:** বর্তমানে ছাত্র নথিভুক্তির সংখ্যা **৪.৩৩ কোটি** ছাড়িয়ে গেছে।
- **GER-এর ব্যবধান:** এত বিস্তার সত্ত্বেও, ২০২২-২৩ সালে GER দাঁড়িয়েছে মাত্র **২৯.৫%**—যা NEP ২০২০-এর লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক কম এবং উন্নত দেশগুলোর বৈশ্বিক গড়ের তুলনায় অনেক নিচে।

এই ব্যবধান একটি কাঠামোগত সত্যকে উন্মোচিত করে: কেবল **ক্যাম্পাস তৈরি করলেই ভবিষ্যৎ তৈরি হয় না**। ওড়িশার গ্রামীণ অঞ্চলের কোনো প্রান্তিক পরিবার বা পাটনার বস্তিবাসী কোনো শিক্ষার্থীর জন্য তিনটি বাধা একসাথে কাজ করে:

1. **সুযোগ (Access):** মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ভৌগোলিক এবং **সামাজিক দূরত্ব**।
2. **সাধ্য (Affordability):** টিউশন ফি, আবাসন এবং জীবনযাত্রার ব্যয়ের **চরম বোঝা**।
3. **আকাঙ্ক্ষা (Aspiration):** প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা **পদ্ধতিগত বর্জনের (Systemic Exclusion)** কারণে আত্মবিশ্বাসের অভাব।

AISHE রিপোর্ট অনুযায়ী, তথ্য একটি গভীর বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরে:

- **তফসিলি জাতি (SC):** মোট নথিভুক্তিতে এদের হার মাত্র **১৪.৯%** (জনসংখ্যার অনুপাত ~১৭%-এর বিপরীতে)।
- **তফসিলি জনজাতি (ST):** নথিভুক্তির হার মাত্র **৫.৮%** (জনসংখ্যার অনুপাত ~৮.৬%-এর বিপরীতে)।
- **লিঙ্গ বৈষম্য:** অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণির **মহিলারা** এখনও STEM (বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত) এবং পেশাদার ক্ষেত্রগুলোতে অত্যন্ত **কম প্রতিনিধিত্ব** করছেন। এই তথ্যগুলো কেবল পরিসংখ্যান নয়—এগুলি আসলে **সাংবিধানিক ব্যর্থতা** যা দ্রুত সমাধানের দাবি রাখে।

নিচে আপনার দেওয়া বিষয়বস্তুর একটি যথাযথ এবং সাবলীল বাংলা অনুবাদ দেওয়া হলো। এখানে **গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলোকে (Key Words)** হাইলাইট করা হয়েছে এবং তথ্যের প্রবাহ বজায় রাখা হয়েছে:

সাংবিধানিক কাঠামো: মৌলিক অধিকার হিসেবে শিক্ষা (Constitutional Framework: Education as a Fundamental Right)

ভারতের সংবিধান একটি শক্তিশালী আদর্শগত কাঠামো প্রদান করে যা শিক্ষায় প্রবেশাধিকারকে—উচ্চশিক্ষাসহ—কেবল একটি নীতিগত পছন্দ নয়, বরং একটি **নৈতিক ও আইনি বাধ্যবাধকতায়** (Moral and Legal Obligation) উন্নীত করে:

- **ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২১এ (৮৬তম সংশোধনী, ২০০২):** ৬-১৪ বছর বয়সী শিশুদের জন্য **বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার** (Right to Free and Compulsory Education), যা একটি বুনিয়াদি ভিত্তি তৈরি করে এবং যৌক্তিকভাবে একে উচ্চশিক্ষার স্তরেও সম্প্রসারিত করা উচিত।
- **ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২১ (জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার):** মোহিনী জৈন বনাম কর্ণাটক রাজ্য এবং উন্নিকৃষ্ণন বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে, শিক্ষার অধিকার **জীবন ও মানবিক মর্যাদার** (Right to Life and Human Dignity) অধিকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ।
- **ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪১ (রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি - DPSP):** রাষ্ট্রকে তার অর্থনৈতিক সামর্থ্যের মধ্যে **শিক্ষার অধিকার** (Right to Education) নিশ্চিত করার নির্দেশ দেয়—এই নির্দেশিকা বর্তমানে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আরও বেশি সক্রিয় পদক্ষেপের দাবি রাখে।
- **ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৬:** রাষ্ট্র তফসিলি জাতি (SC), তফসিলি জনজাতি (ST) এবং অন্যান্য দুর্বল শ্রেণির শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক স্বার্থের উন্নয়ন করবে এবং তাদের **সামাজিক অবিচার** (Social Injustice) থেকে রক্ষা করবে।
- **ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫(৫):** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সামাজিকভাবে এবং শিক্ষাগতভাবে অনগ্রসর শ্রেণির জন্য **সংরক্ষণ এবং বিশেষ বিধান** (Reservation and Special Provisions) কার্যকর করতে সক্ষম করে।
- **ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৮ ও ৩৯:** রাষ্ট্রকে আয়, মর্যাদা এবং সুযোগের ক্ষেত্রে **বৈষম্য হ্রাস** (Minimising Inequalities) করার চেষ্টা করতে হবে—যা বৃত্তির নীতিকে নিছক কোনো দয়া নয়, বরং একটি **সাংবিধানিক হাতিয়ার** (Constitutional Instrument) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

যখন বৃত্তিগুলো সঠিকভাবে পরিকল্পিত এবং বাস্তবায়িত হয়, তখন সেগুলিই হয় সেই মাধ্যম যার মাধ্যমে **সাংবিধানিক আকাঙ্ক্ষা** (Constitutional Aspirations) বাস্তব জীবনে রূপ পায়। একজন সক্ষম কিন্তু দরিদ্র শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদানে অস্বীকার করা কেবল একটি প্রশাসনিক ব্যর্থতা নয়—এটি একটি **সাংবিধানিক লঙ্ঘন** (Constitutional Transgression)।

অশোক কুমার ঠাকুর বনাম ভারত ইউনিয়ন মামলায় সুপ্রিম কোর্ট পুনর্ব্যক্ত করেছে যে, শিক্ষায় **প্রকৃত সাম্য** (Substantive Equality) প্রতিষ্ঠার জন্য অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করা রাষ্ট্রের একটি ইতিবাচক কর্তব্য। বৃত্তি হলো এই কর্তব্যেরই **বাস্তবায়ন** (Operationalisation)।

কেন বৃত্তি শিক্ষাগত রূপান্তরের মূল ভিত্তি

১. বৃত্তি সুযোগের সমস্যার সমাধান করে

- বৃত্তি দূরবর্তী, গ্রামীণ এবং অনুন্নত অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের দূরত্ব, সুযোগের অভাব এবং **সামাজিক প্রতিকূলতার** (Social Disadvantage) বাধা কমিয়ে উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ করতে সাহায্য করে।
- এগুলি নিশ্চিত করে যে ভৌগোলিক বা অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা যেন মেধাবী শিক্ষার্থীদের পথে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়, যার ফলে ক্যাম্পাসে **অন্তর্ভুক্তি এবং প্রতিনিধিত্ব** (Inclusivity and Representation) বৃদ্ধি পায়।

২. বৃত্তি আর্থিক সাধ্যের সংকট দূর করে

- উচ্চশিক্ষা প্রায়শই মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোর জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

- বৃত্তি টিউশন ফি, থাকার খরচ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় বহন করে এই বোঝা কমায়, যা শিক্ষার্থীদের **আর্থিক উদ্বেগহীনভাবে** (Without Financial Stress) পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে সাহায্য করে।

৩. **বৃত্তি গুণমান এবং ফলাফলের উন্নতি ঘটায়**

- বৃত্তি কেবল নথিভুক্তি বাড়ায় না, বরং শিক্ষার্থীদের **একাডেমিক কর্মদক্ষতা এবং স্থায়িত্ব** (Retention) বৃদ্ধি করে।
- সহায়তা প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা সময়মতো ডিগ্রি সম্পন্ন করতে এবং স্থিতিশীল ক্যারিয়ার গড়তে সক্ষম হয়, অন্যদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো একটি **বৈচিত্র্যময় এবং উচ্চ-মানসম্পন্ন** (Diverse and High-Quality) পরিবেশ থেকে উপকৃত হয়।

৪. **বৃত্তি সুপ্ত প্রতিভা উন্মোচন করে**

- ভারতের প্রতিভা বিভিন্ন অঞ্চল, জাতি এবং লিঙ্গের মধ্যে ছড়িয়ে আছে, কিন্তু কাঠামোগত বাধার কারণে অনেকেই সুযোগ পায় না।
- বৃত্তি **প্রতিভা এবং সুযোগের মধ্যে একটি সেতু** (Bridge between Talent and Opportunity) হিসেবে কাজ করে, যা জাতীয় উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

৫. **বৃত্তি সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে**

- আধুনিক বৃত্তি কেবল আর্থিক সহায়তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এতে **পরামর্শ** (Mentorship), **নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ এবং ক্যারিয়ার নির্দেশিকা** (Career Guidance) অন্তর্ভুক্ত থাকে।
- এই ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থান এবং সমাজে নেতৃত্বের ভূমিকার জন্য প্রস্তুত করে।

৬. **বৃত্তি সামাজিক গতিশীলতা বৃদ্ধি করে** (Scholarships Strengthen Social Mobility)

- বৃত্তি অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীর জন্য মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ তৈরি করে **দারিদ্র্য ও বৈষম্যের চক্র** (Cycle of Poverty and Inequality) ভাঙতে সাহায্য করে।
- এটি শিক্ষার্থীদের **উচ্চতর সামাজিক অবস্থানের** (Upward Social Mobility) দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং একটি ন্যায়সঙ্গত সমাজ গঠন করে।

৭. **বৃত্তি সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার ত্বরান্বিত করে**

- বৃত্তি একটি **সমতা আনয়নকারী** (Equaliser) হিসেবে কাজ করে, যা বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে আসা শিক্ষার্থীদের একই স্তরে প্রতিযোগিতা করার সুযোগ দেয়।
- এটি নিশ্চিত করে যে শিক্ষার্থীর জন্মস্থান বা অর্থনৈতিক অবস্থার ঊর্ধ্বে উঠে কেবল **মেধার আবিষ্কার ও পরিচর্যা** (Merit Discovery and Nurturance) করা হয়, যা শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও ন্যায়বিচার সুদৃঢ় করে।

ভারতের প্রাচীন বৌদ্ধিক ঐতিহ্য থেকে শিক্ষা

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতি কোনো আধুনিক উদ্ভাবন নয়—এটি একটি **সভ্যতাগত মূল্যবোধ** (Civilisational Value)। তক্ষশীলা এবং নালন্দার মতো বিশ্বের প্রথম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কোনো শিক্ষার্থীকেই সম্পদের অভাবে ফিরিয়ে দেওয়া হতো না। প্রাচীন এই ব্যবস্থায় অর্থ প্রদানের একাধিক **নমনীয় পথ** (Flexible Pathways) ছিল:

- **সক্ষমদের জন্য:** সরাসরি অগ্রিম অর্থ প্রদান।
- **শ্রমদান:** টিউশন ফি হিসেবে শিক্ষকের সাথে কাজ করা এবং শেখা।
- **শিক্ষা-পরবর্তী অবদান:** জীবিকা নিশ্চিত করার পর শিক্ষালয়কে অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া।
- **সামাজিক ও রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা:** দূরবর্তী অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের জন্য সম্প্রদায় বা রাজাদের পক্ষ থেকে সহায়তা।

এর মূল নীতি ছিল **"বিদ্যা দদাতি বিনয়ম"** (বিদ্যা বিনয় দান করে)—অর্থাৎ কোনো সক্ষম শিক্ষার্থী যেন বস্তুগত দারিদ্র্যের কারণে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয়। একে রাষ্ট্র এবং শিক্ষিত সমাজের একটি **"ধার্মিক বাধ্যবাধকতা"** (Dharmic Obligation) হিসেবে গণ্য করা হতো।

বর্তমান বৃত্তি কাঠামোর প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, বেশ কিছু **কাঠামোগত ঘাটতি** (Structural Gaps) এই ব্যবস্থার রূপান্তরকারী সম্ভাবনাকে ব্যাহত করছে:

- **বার্ষিক নবায়নের বাধ্যবাধকতা** (Transactional, Annual Renewals): বেশিরভাগ স্কিমেই প্রতি বছর পুনরায় আবেদন করতে হয়, যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে **মানসিক উদ্বেগ** এবং প্রশাসনিক জটিলতা তৈরি করে।
- **সংকীর্ণ পরিধি** (Narrow Scope): অধিকাংশ বৃত্তি কেবল টিউশন ফি কভার করে। কিন্তু আবাসন, খাদ্য, **ডিজিটাল ডিভাইস** এবং স্বাস্থ্যসেবার মতো **"লুকানো খরচ"** (Hidden Costs) গুলো উপেক্ষা করা হয়, যা অনেক সময় ড্রপআউটের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
- **তথ্যের অসামঞ্জস্য** (Information Asymmetry): এনএসপি (NSP) থাকা সত্ত্বেও গ্রামীণ অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী সচেতনতার অভাব এবং **ডিজিটাল নিরক্ষরতার** কারণে এই সুযোগগুলো সম্পর্কে জানতে পারে না।
- **পরামর্শদাতার অভাব** (Absence of Mentorship): প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের জন্য কেবল আর্থিক সাহায্য যথেষ্ট নয়; অপরিচিত প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে তাদের **সামাজিক ও একাডেমিক নির্দেশনার** (Mentorship) প্রয়োজন।
- **বেসরকারি খাতের কম অংশগ্রহণ** (Private Sector Underengagement): বিশ্ববাজারের তুলনায় ভারতীয় কর্পোরেটগুলো **সিএসআর** (CSR) তহবিলের মাধ্যমে শিক্ষা খাতে অনেক কম বিনিয়োগ করে। দাতা-নির্ভর বৃত্তির কাঠামোটি এখনও বেশ দুর্বল।
- **তথ্যের অভাব** (Data Deficits): বৃত্তির ফলাফল—যেমন গ্র্যাজুয়েশন হার বা কর্মসংস্থানের হার—ট্র্যাকিং করার সঠিক ব্যবস্থা নেই, যা **তথ্য-ভিত্তিক নীতি** (Evidence-based Policy) প্রণয়নে বাধা দেয়।

সরকারি উদ্যোগ এবং প্রাতিষ্ঠানিক উদ্ভাবন

- **ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টাল** (NSP): এটি একটি **একক-উইন্ডো ইন্টারফেস** (Single-window Interface) হিসেবে কাজ করে, যা আবেদন এবং অর্থ বিতরণ প্রক্রিয়াকে সহজতর করে।
- **পিএম-ইউএসপি** (PM-USP) **যোজনা:** বার্ষিক ৪.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়কারী পরিবারের শিক্ষার্থীদের জন্য এটি শিক্ষা ঋণের ওপর **সম্পূর্ণ সুদ ভর্তুকি** (Full Interest Subsidy) প্রদান করে।
- **প্রগতি ও সক্ষম** (PRAGATI & SAKSHAM): এআইসিটিই (AICTE) পরিচালিত এই স্কিমগুলোর মধ্যে **প্রগতি** কারিগরি শিক্ষায় নারী শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করে এবং **সক্ষম** বিশেষভাবে সক্ষম শিক্ষার্থীদের সহায়তা দেয়।
- **ন্যাশনাল মিনস-কাম-মেরিট স্কলারশিপ** (NMMSS): এটি নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বার্ষিক ১২,০০০ টাকা প্রদান করে ড্রপআউট রোধে এবং উচ্চশিক্ষার **ফিডার** (Feeder) হিসেবে কাজ করে।
- **প্রাতিষ্ঠানিক শ্রেষ্ঠত্ব**
  - **অশোকা ইউনিভার্সিটি** (Ashoka University): তারা একটি **আর্থিক অবস্থা-সংবেদনশীল** (Need-sensitive) ভর্তি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। বর্তমানে তাদের প্রায় ২০% শিক্ষার্থী **১০০% বৃত্তি** নিয়ে পড়াশোনা করছে।
  - **ইন্ডিয়ান স্কুল অফ বিজনেস** (ISB) **মডেল:** আইএসবি একটি শক্তিশালী **দাতা-সমর্থিত ইকোসিস্টেম** তৈরি করেছে। তাদের নতুন পিজিপি-ইয়ং লিডারস (PGP-Young Leaders) প্রোগ্রামের **৪০% শিক্ষার্থী** বৃত্তির মাধ্যমে সাহায্যপ্রাপ্ত।

নিচে আপনার প্রদান করা তথ্যের একটি নির্ভুল, সংক্ষিপ্ত এবং সাবলীল বাংলা অনুবাদ দেওয়া হলো:

বৈশ্বিক শ্রেষ্ঠ অনুশীলন

- **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র:** শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো **বহু-বর্ষীয় সহায়তা প্যাকেজ** (Multi-year Aid Packages) প্রদান করে। হার্ভার্ড বা ইয়েলের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো **"নিড-ব্লাইন্ড"** (Need-Blind) ভর্তি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে, যেখানে মেধা থাকলে অর্থের অভাব পড়ার পথে বাধা হয় না।
- **চীন:** স্থানীয় উন্নয়নের প্রয়োজনে **প্রাদেশিক ও শহর-ভিত্তিক বৃত্তি** প্রদান করে। যেমন- কোনো শহরে প্রকৌশলীর অভাব থাকলে সেই নির্দিষ্ট বিষয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বেশি অর্থ বরাদ্দ করা হয়।
- **ব্রাজিল:** তাদের PROUNI প্রোগ্রাম বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিম্ন আয়ের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেয়, যা **সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের** (PPP) মাধ্যমে শিক্ষার প্রসারের একটি বড় উদাহরণ।

ভবিষ্যতের পথনির্দেশ

- **বহু-বর্ষীয় আর্থিক নিরাপত্তা ও আইনি অধিকার:** বার্ষিক নবায়নের বদলে **৩-৫ বছরের গ্যারান্টিযুক্ত বৃত্তি** দিতে হবে। একটি **"জাতীয় বৃত্তি অধিকার আইন"** (National Scholarship Rights Act) প্রণয়ন করা প্রয়োজন, যাতে বৃত্তি কেবল দয়া নয়, বরং আইনি অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- **অঞ্চল ও আকাঙ্ক্ষা-ভিত্তিক লক্ষ্য নির্ধারণ:** বিহার, উত্তরপ্রদেশ বা উত্তর-পূর্ব ভারতের মতো **শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে পড়া জেলাগুলোর** জন্য বিশেষ তহবিল গঠন করতে হবে, যাতে মেধা স্থানীয় স্তরেই বিকশিত হতে পারে।
- **দানশীলতার জন্য আর্থিক কাঠামো:** শিক্ষা খাতে কর্পোরেট বিনিয়োগ বাড়াতে বিশেষ **কর ছাড়** (Tax Incentives) দিতে হবে। একটি **"জাতীয় শিক্ষা এনডাউমেন্ট ফান্ড"** গঠন করা জরুরি যা বার্ষিক বাজেটের ওপর নির্ভরশীল হবে না।
- **সামগ্রিক সহায়তা ব্যবস্থা:** বৃত্তির সাথে **পরামর্শ** (Mentorship), ক্যারিয়ার গাইডেন্স এবং মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তাক অন্তর্ভুক্ত করা বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- **প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতা ও উদীয়মান প্রযুক্তি:** যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সফলভাবে শিক্ষার্থীদের গ্র্যাজুয়েশন ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করবে, তাদের NIRF/NAAC র‍্যাঙ্কিংয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। AI **(কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা)** বা গ্রিন এনার্জির মতো নতুন ক্ষেত্রে বিশেষ বৃত্তি চালু করতে হবে।
- **রিয়েল-টাইম অ্যানালিটিক্স ড্যাশবোর্ড:** একটি ডিজিটাল ড্যাশবোর্ড তৈরি করতে হবে যা শিক্ষার্থীদের ভর্তি থেকে চাকরি পাওয়া পর্যন্ত গতিবিধি ট্র্যাক করবে এবং তথ্যের ভিত্তিতে নীতি পরিবর্তন করবে।

উপসংহার

বৃত্তি হলো **সাম্য** (Equity), **গুণমান** (Quality) এবং **জাতীয় প্রবৃদ্ধির** (Growth) সংযোগস্থল। বৃত্তিকে সরকারি নীতির প্রান্তিক পর্যায় থেকে মূল কেন্দ্রে নিয়ে আসা কেবল অর্থ বরাদ্দের বিষয় নয়—এটি ভারত আগামী দিনে কেমন রাষ্ট্র হতে চায়, সেই **সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়**। তক্ষশীলা ও নালন্দার উত্তরাধিকারী হিসেবে আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে, মেধা যেন কখনও অর্থের অভাবে হারিয়ে না যায়।

Q. Scholarships are not merely financial aid but instruments of social transformation. Elaborate with suitable examples. 15 Marks

1.1.2. নির্বাচনী প্রাণবন্ততা: ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোয় উচ্চ ভোটার উপস্থিতির বিশ্লেষণ

ভূমিকা

- সম্প্রতি ভারত তার গণতান্ত্রিক চেতনার এক শক্তিশালী বহিঃপ্রকাশ প্রত্যক্ষ করেছে — **আসাম, পুদুচেরি এবং কেরালা** তাদের নির্বাচনী ইতিহাসে **সর্বোচ্চ ভোটার উপস্থিতির** অন্যতম নজির গড়েছে। এটি পুনরায় নিশ্চিত করে যে, নাগরিকরা তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় গভীরভাবে জড়িত।
- তবে, এই একই নির্বাচনী চক্রে **ভোটার তালিকার সততা**, সম্ভাব্য **ভোটাধিকার বঞ্চিত হওয়া**, এবং ভোটার তালিকা পরিমার্জন ও প্রতিটি নাগরিকের ভোটের অধিকার রক্ষার মধ্যে **সূক্ষ্ম ভারসাম্য** নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠেছে — যা একটি গণতন্ত্র উপেক্ষা করতে পারে না।

প্রেক্ষাপট: আসলে কী ঘটেছিল?

- **উপস্থিতির পরিসংখ্যান (Turnout Figures): পুদুচেরি ৯১.২৩%** ভোটার উপস্থিতি নিয়ে শীর্ষে ছিল (একটি ঐতিহাসিক উচ্চতা); এর পরেই ছিল **আসাম ৮৫.৯১%** (সর্বকালের রেকর্ড) এবং **কেরালা ৭৮.২৭%** (প্রায় সর্বোচ্চ)।
- **ভোটার তালিকা সংশোধন (Electoral Roll Revision):** নির্বাচনের আগে ভারতের নির্বাচন কমিশন (ECI) ভোটার তালিকার **বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR)** কার্যক্রম পরিচালনা করে। এর ফলে পুদুচেরিতে ভোটার সংখ্যা **৭.৫% হ্রাস** পায়, কেরালায় **৩.২%** এবং আসামে (NRC প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত বিশেষ সংশোধনের অধীনে) ভোটার সংখ্যা **১%-এরও কম হ্রাস** পায়।
- **নির্বাচন কমিশনের প্রতিক্রিয়া (ECI's Response):** মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এই উচ্চ ভোটার উপস্থিতিকে কেবল ভারতের জন্য নয়, সমগ্র গণতান্ত্রিক বিশ্বের জন্য একটি **'ঐতিহাসিক সাক্ষ্য' (Historic Testimony)** হিসেবে অভিহিত করেছেন। এই বক্তব্য যেমন প্রাতিষ্ঠানিক গর্ব প্রতিফলিত করে, তেমনি এই সংখ্যার নেপথ্যে প্রকৃত কারণগুলো খতিয়ে দেখার প্রয়োজনীয়তাও তৈরি করে।

ভোটের গুরুত্ব — কেন প্রতিটি ভোট মূল্যবান

১. **ভোটদান শাসনব্যবস্থাকে বৈধতা দেয় (Legitimises Governance): জনগণের সার্বভৌমত্বের (Popular Sovereignty)** নীতি—অর্থাৎ রাষ্ট্রের ক্ষমতা শাসিতের সম্মতির ওপর নির্ভরশীল—কেবল ভোটদানের মাধ্যমেই কার্যকর হয়।

- 'ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ইলেক্টোরাল অ্যাসিস্ট্যান্স' (IDEA)-এর মতে, যেসব দেশে ভোটার উপস্থিতির হার বেশি, সেখানে সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওপর জনগণের **আস্থা ও বিশ্বাস (Public Trust)** বেশি থাকে। যখন আসামে **৮৫.৯১%** ভোট পড়েছিল, তখন এটি কেবল কোনো একটি দলের প্রতি নয়, বরং সামগ্রিক **গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি গণসমর্থন** হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল।

২. **ভোটদান অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে (Inclusive Representation):** গণতন্ত্রে যদি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেমন—নারী, অভিবাসী বা আদিবাসী জনগণের ভোটের হার কম হয়, তবে তা নীতি নির্ধারণে **অন্ধবিন্দু বা ত্রুটি (Policy Blind Spots)** তৈরি করে।

- আসামে বিপুল সংখ্যক **পরিযায়ী শ্রমিক (Migrant Workers)** ভোট দেওয়ার জন্য তাদের নিজ নির্বাচনী এলাকায় ফিরে গিয়েছিলেন; এটি একটি বড় প্রমাণ যে **গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ** অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতাকেও ছাপিয়ে যায়। এটি বেলজিয়াম বা অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশের কথা মনে করিয়ে দেয় যেখানে **বাধ্যতামূলক ভোটদান (Compulsory Voting)** সকল সামাজিক স্তরের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে।

৩. **উচ্চ ভোটার উপস্থিতি ক্ষমতার ওপর নিয়ন্ত্রণ (Check on Incumbency):** ভোটার অংশগ্রহণ একটি **গণতান্ত্রিক অডিট ব্যবস্থা** হিসেবে কাজ করে। কেরালা, আসাম ও পুদুচেরি—এই তিন রাজ্যেই ক্ষমতাসীন দল উচ্চ উপস্থিতিকে **আস্থার ভোট (Vote of Confidence)** হিসেবে দাবি করেছে, অন্যদিকে বিরোধীরা একে **পরিবর্তনের ঢেউ (Surge for Change)** হিসেবে ব্যাখ্যা করেছে।

- এই ব্যাখ্যামূলক প্রতিযোগিতা ইতিবাচক—এর অর্থ হলো ক্ষমতার চাবিকাঠি অভিজাতদের হাতে নয়, বরং **ভোটারদের হাতে**। ভারতের সংবিধানের **ধারা ৩২৬ (Article 326)** 'সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার' নিশ্চিত করে এবং প্রতিটি উচ্চ-উপস্থিতির নির্বাচন এই **সাংবিধানিক অঙ্গীকারকে** আরও শক্তিশালী করে।

৪. **উপস্থিতি নাগরিক সচেতনতার প্রতিফলন (Civic Consciousness):** কেরালার ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, পশ্চিম এশিয়ায় বসবাসরত **প্রবাসী ভোটাররা (Diaspora)** যুদ্ধের কারণে আসতে না পারলেও ভোটদানের হার ঐতিহাসিকভাবে বেশি ছিল। এটি প্রমাণ করে যে অভ্যন্তরীণ ভোটাররা অভূতপূর্ব সংখ্যায় এগিয়ে এসেছেন, যা গভীর **নাগরিক সচেতনতা** প্রকাশ করে।

৫. **ভোটাধিকার হরণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হিসেবে ভোটদান:** আশ্চর্যজনকভাবে, ভোটার তালিকা সংশোধন (SIR process) থেকে বাদ পড়ার আশঙ্কাই হয়তো অনেক নাগরিককে সক্রিয়ভাবে তাদের নাম নিশ্চিত করতে এবং ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

- এটি একটি শক্তিশালী দিক—**বাদ পড়ার হুমকি** নিজের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি **মালিকানা বোধ (Sense of Ownership)** বাড়িয়ে দিয়েছে। ১৯৫২ সালে ভারতের ভোটার উপস্থিতি ছিল **৪৫.৭%**, যা বর্তমানে নিয়মিত **৬৫-৭০%**-এর উপরে থাকে, যা দেশের **গণতান্ত্রিক পরিপক্কতার (Democratic Maturity)** পরিচায়ক।

চ্যালেঞ্জসমূহ — উচ্চ ভোটার উপস্থিতি সত্ত্বেও যখন গণতন্ত্র বিঘ্নিত হয়

১. **ভোটার তালিকার সংকোচন এবং ভোটাধিকার হরণের ভয়:** ভুয়া ভোটার বা দ্বৈত নাম বাদ দেওয়া বৈধ কাজ হলেও, পুদুচেরিতে **৭.৫%** এবং কেরালায় **৩.২%** ভোটারের নাম **আগ্রাসীভাবে ছাঁটাই (Aggressive Purging)** করা প্রকৃত ভোটারদের বাদ পড়ার ঝুঁকি বাড়ায়। ভোটার সংখ্যা কমে গেলে গাণিতিকভাবে উপস্থিতির হার **কৃত্রিমভাবে বেড়ে (Artificially Inflates)** যায়, যা প্রকৃত জনঅংশগ্রহণের প্রতিফলন নাও হতে পারে।

২. **আসামে এনআরসি (NRC) সংক্রান্ত উদ্বেগ:** আসামে **এনআরসি (National Register of Citizens)** প্রক্রিয়ার কারণে প্রায় ১৯ লক্ষ মানুষ নাগরিকত্ব থেকে বাদ পড়েছেন। সেখানে ভোটদান কেবল নাগরিক অধিকার নয়, বরং নিজেদের **অস্তিত্ব বা পরিচয়ের এক মরিয়া লড়াই (Desperate Assertion of Belonging)**। এখানে অংশগ্রহণ স্বতঃস্ফূর্ত গণতান্ত্রিক উৎসাহের চেয়ে **ভীতি (Fear)** দ্বারা বেশি চালিত হতে পারে।

৩. **নির্বাচন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক গ্রহণযোগ্যতা:** নির্বাচন কমিশন (ECI) বর্তমানে বিভিন্ন সমালোচনার মুখে পড়ছে—যেমন নির্বাচনের তফসিল ঘোষণায় দেরি, ভোটার তালিকা ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি এবং SIR বাস্তবায়ন। উচ্চ ভোটার উপস্থিতিকে এই **প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতাগুলোর (Institutional Concerns)** আড়াল হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়।

৪. **পরিযায়ী ভোটারদের বঞ্চনা:** আসামের পরিযায়ী শ্রমিকরা ফিরে আসতে পারলেও, কেরালার প্রবাসীরা ভূ-রাজনৈতিক কারণে ভোট দিতে পারেননি। ফ্রান্স বা এস্তোনিয়ার মতো ভারতে এখনও কোনো শক্তিশালী **অনলাইন ভোটিং (E-voting)** বা **প্রক্সি ভোটিং (Proxy Voting)** ব্যবস্থা নেই। **জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০ (RPA 1950)** প্রবাসীদের নিবন্ধনের অনুমতি দিলেও ভোট দেওয়ার জন্য **শারীরিক উপস্থিতি (Physical Presence)** এখনও বাধ্যতামূলক, যা একটি বড় কাঠামোগত অভাব।

৫. **অর্থের প্রভাব এবং নির্বাচনী কারচুপি:** উচ্চ ভোটার উপস্থিতি মানেই যে নির্বাচন **অবাধ ও সুষ্ঠু (Free and Fair)** তা নয়। ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থায় এখনও ভোটারদের **প্রলোভন (Inducement)** দেখানো, নগদ টাকা ও উপহার বিতরণ এবং ভীতি প্রদর্শনের মতো ঘটনা ঘটে। ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন প্রায় **১০,০০০ কোটি টাকার** নগদ ও উপহার সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছে, যা **নির্বাচনী সততার (Electoral Integrity)** সংকটের দিকে আঙুল তোলে।

৬. **সীমানা নির্ধারণ (Delimitation) ও নারী সংরক্ষণ:** আসন্ন **সীমানা নির্ধারণ প্রক্রিয়া** এবং লোকসভা ও বিধানসভায় **৩৩% নারী সংরক্ষণ (১০৬তম সংবিধান সংশোধন আইন, ২০২৩)** বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কারচুপির ঝুঁকি থাকে। যদি ভোটার গোষ্ঠীগুলোকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ভাগ করা হয়, তবে উচ্চ ভোটার উপস্থিতি সত্ত্বেও গণতন্ত্রের প্রকৃত ফলাফল **বৈষম্যমূলক (Representational Distortion)** হতে পারে।

বৈশ্বিক সেরা অনুশীলন — ভারতের জন্য শিক্ষণীয়

- **স্বয়ংক্রিয় ভোটার নিবন্ধন (Automatic Voter Registration - কানাডা, আমেরিকা):** কানাডার মতো দেশগুলোতে নাগরিকরা যখন সরকারি পরিষেবা (যেমন: ড্রাইভিং লাইসেন্স) গ্রহণ করেন, তখন তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত হন। এটি ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় ভুলবশত বাদ পড়ার ঝুঁকি কমায়। ভারত **আধার-লিঙ্কড স্বয়ংক্রিয় ভোটার নিবন্ধন** ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে পারে।
- **স্বাধীন নির্বাচন কমিশন (Independent Election Commissions - দক্ষিণ আফ্রিকা, সুইডেন):** দক্ষিণ আফ্রিকার নির্বাচন কমিশন বহুদলীয় সংসদীয় তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে কাঠামোগত স্বাধীনতা বজায় রাখে। ভারতের নির্বাচন কমিশন (ECI) সাংবিধানিকভাবে স্বাধীন হলেও, কমিশনার নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। **নির্বাচন কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২৩**-এর পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন।
- **প্রবাসীদের জন্য রিমোট এবং ই-ভোটিং (Remote & e-Voting - এস্তোনিয়া, ফ্রান্স):** এস্তোনিয়া ২০০৫ সাল থেকে **ইন্টারনেট-ভিত্তিক ভোটিং (i-voting)** চালু করেছে। ভারতের ১৩ মিলিয়নেরও বেশি অনাবাসী ভারতীয়দের (NRIs) জন্য নিরাপদ **ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্ম** পাইলট প্রকল্প হিসেবে শুরু করা যেতে পারে।
- **নাগরিক শিক্ষা কার্যক্রম (Civic Education - ফিনল্যান্ড, জাপান):** ফিনল্যান্ড স্কুল পাঠ্যক্রমেই নির্বাচনী সাক্ষরতা অন্তর্ভুক্ত করে। ভারতের SVEEP (Systematic Voters' Education and Electoral Participation) কর্মসূচিটি প্রশংসনীয়, তবে গ্রামীণ ও আদিবাসী এলাকায় এর প্রসার আরও বাড়ানো প্রয়োজন।

ভবিষ্যতের পথনির্দেশ — এই গতিশীলতাকে কাজে লাগানো

১. **ভোটার তালিকা সংশোধন (SIR) প্রক্রিয়ার সংস্কার:** নির্বাচন কমিশনকে **'অন্তর্ভুক্তি'কে (Inclusion)** অগ্রাধিকার দিতে হবে। যথাযথ নোটিশ এবং আপিল করার সুযোগ ছাড়া কোনো ভোটারকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যাবে না।

২. **সীমানা নির্ধারণে সাংবিধানিক সুরক্ষা:** আসন্ন **সীমানা নির্ধারণ (Delimitation)** প্রক্রিয়াটি একটি স্বাধীন কমিশনের নেতৃত্বে হতে হবে, যেখানে স্বচ্ছ পদ্ধতি এবং **বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা (Judicial Review)** থাকবে।

৩. **নারী সংরক্ষণ কার্যকর করা: ৩৩% নারী সংরক্ষণ** যেন কেবল সংখ্যার পরিবর্তন না হয়। নির্বাচিত নারীরা যাতে কারও 'প্রক্সি' হিসেবে কাজ না করে প্রকৃত **রাজনৈতিক কর্তৃত্ব (Political Agency)** চর্চা করতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে হবে।

৪. **রিমোট ভোটিং-এর পাইলট প্রকল্প:** পরিযায়ী শ্রমিক এবং প্রবাসীদের (NRIs) জন্য **সাইবার নিরাপত্তা** নিশ্চিত করে ই-ভোটিং ব্যবস্থা চালু করার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা উচিত।

৫. **কাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে আস্থা পুনরুদ্ধার: অনুপ বার্নওয়াল বনাম ভারত ইউনিয়ন (২০২৩)** মামলায় সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ অনুযায়ী, নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বিচার বিভাগের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে একে নির্বাহী বিভাগের প্রভাবমুক্ত করতে হবে।

৬. **নির্বাচনী সাক্ষরতা বৃদ্ধি:** উচ্চ ভোটার উপস্থিতিতে আত্মতুষ্টির সুযোগ নেই। শহুরে ভোটারদের উদাসীনতা কাটাতে এবং সচেতনতা বাড়াতে SVEEP উদ্যোগকে জাতীয় পর্যায়ে আরও বড় মাপে ছড়িয়ে দিতে হবে।

উপসংহার

২০২৬-এর নির্বাচনে রেকর্ড ভোটার উপস্থিতি প্রমাণ করে যে, ভারতীয় নাগরিকরা **ব্যালট বক্সকে** পরিবর্তন ও আত্মপ্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত হাতিয়ার হিসেবে দেখেন। দেশ যখন সীমানা নির্ধারণ এবং লিঙ্গ সমতার নতুন যুগে পদার্পণ করছে, তখন লক্ষ্য হতে হবে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে প্রতিটি নাগরিকের জন্য আরও **অন্তর্ভুক্তিমূলক, স্বচ্ছ এবং সহজলভ্য** করে তোলা।

Q. High voter turnout is a necessary but not sufficient condition for a healthy democracy. Critically examine in the context of electoral integrity and governance in India. 15 Marks

1.1.3. সীমাহীন নির্বাহী ক্ষমতা: প্রধানমন্ত্রী পদের মেয়াদ বিতর্ক

ভূমিকা

- সম্প্রতি একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক অর্জিত হয়েছে—রাষ্ট্রীয় ও কেন্দ্রীয় স্তরে টানা **৮,৯৩১ দিন** নির্বাচিত সরকারের প্রধান হিসেবে কাজ করার দীর্ঘতম মেয়াদের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে।
- এই ঘটনাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক বিতর্ককে পুনরুজ্জীবিত করেছে: যেখানে আলঙ্কারিক প্রধান হিসেবে **রাষ্ট্রপতির** ক্ষেত্রে অনানুষ্ঠানিকভাবে **দুই মেয়াদের সীমাবদ্ধতা** রয়েছে, সেখানে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী **প্রধানমন্ত্রীর** ক্ষেত্রে এমন কোনও বিধিনিষেধ নেই।
- এই বৈষম্য বা **অসামঞ্জস্য** (Asymmetry) গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা, প্রাতিষ্ঠানিক সুস্থতা এবং ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের দীর্ঘমেয়াদী প্রাণশক্তি নিয়ে জরুরি প্রশ্ন উত্থাপন করে।

মূল ভারসাম্যহীনতা: রাষ্ট্রপতি বনাম প্রধানমন্ত্রী

ভারতের সংবিধান তার সর্বোচ্চ দুটি নির্বাহী পদের মধ্যে একটি লক্ষণীয় ভারসাম্যহীনতা প্রতিফলিত করে। **ধারা ৫২ থেকে ৬২**-এর অধীনে রাষ্ট্রপতি মূলত একজন আলঙ্কারিক প্রধান। তিনি কেবল সাংবিধানিক বিধান নয়, বরং একটি অনানুষ্ঠানিক কিন্তু ব্যাপকভাবে স্বীকৃত **'দুই মেয়াদের প্রথা'** দ্বারা পরিচালিত হন।

- এর বিপরীতে, প্রধানমন্ত্রী—যাঁর পদের ক্ষমতা মূলত **ধারা ৭৪ এবং ৭৫** থেকে উদ্ভূত (যেখানে রাষ্ট্রপতিকে সহায়তা ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রী পরিষদের বিধান রয়েছে)—তিনিই **প্রকৃত নির্বাহী ক্ষমতা** প্রয়োগ করেন।
- লক্ষণীয় যে, রাষ্ট্রপতির কার্যকাল আনুষ্ঠানিকভাবে পাঁচ বছর (পুনর্নির্বাচনের যোগ্যতা সহ), কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদের ওপর কোনও **সুস্পষ্ট সাংবিধানিক সীমা** আরোপ করা হয়নি।
- ফলস্বরূপ, যতদিন লোকসভায় সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় থাকে, প্রধানমন্ত্রী অনির্দিষ্টকাল পদে বহাল থাকতে পারেন, যা সাংবিধানিক কাঠামোর অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্যকে আরও শক্তিশালী করে।

ক. রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে অনুসৃত প্রথা

- **আইভর জেনিংস টেস্ট** (Ivor Jennings Test): রাষ্ট্রপতির তৃতীয় মেয়াদের বিরুদ্ধে এই প্রথাটি তিনটি শর্ত পূরণ করে—একটি নজির থাকতে হবে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তা পালনে বাধ্য অনুভব করতে হবে এবং এর পেছনে একটি স্পষ্ট সাংবিধানিক কারণ থাকতে হবে। ভারতের রাষ্ট্রপতি পদের ক্ষেত্রে এই তিনটি শর্তই রক্ষিত হয়েছে।
- **আইনি বাধা ছাড়াই শক্তিশালী নৈতিক শক্তি:** সংবিধানের **ধারা ৫৭** রাষ্ট্রপতি হিসেবে আনলিমিটেড বা সীমাহীন পুনর্নির্বাচনের অনুমতি দিলেও ১৯৫০ সালের পর থেকে কোনও রাষ্ট্রপতিই তৃতীয় মেয়াদের চেষ্টা করেননি। এখানে **সাংবিধানিক নৈতিকতা** (Constitutional Morality) একটি কার্যত 'টার্ম লিমিট' বা মেয়াদের সীমাবদ্ধতা হিসেবে কাজ করেছে।

- **ঐতিহাসিক রেকর্ড:** ১৯৫০ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত শুধুমাত্র **ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ** দুই পূর্ণ মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেছেন। তারপর থেকে কোনও ব্যক্তিই এই অনানুষ্ঠানিক সীমা অতিক্রম করেননি।

খ. প্রধানমন্ত্রীর পদের বাস্তবতা

- **পরিকল্পিত সীমাহীন মেয়াদ:** ধারা ৭৪ এবং ৭৫ প্রধানমন্ত্রীর পদ প্রতিষ্ঠা করলেও মেয়াদের কোনো ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ করেনি। একমাত্র শর্ত হলো **লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন**।
- **ক্ষমতার প্যারাডক্স (The Power Paradox):** যে পদের হাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা—মন্ত্রিসভা নিয়ন্ত্রণ, উচ্চপদস্থ নিয়োগ এবং নীতি নির্ধারণ—সেই পদের ওপরই বিধিনিষেধ সবচেয়ে কম। এটি খসড়া তৈরির কোনো ত্রুটি নয়, বরং একটি **সুচিন্তিত সাংবিধানিক সিদ্ধান্ত** ছিল।

মূল তথ্য (KEY FACT): ১৯৪৭ সাল থেকে **ভারতে ১৫ জন প্রধানমন্ত্রী** দায়িত্ব পালন করেছেন। দীর্ঘতম সময় দায়িত্ব পালনকারী প্রধানমন্ত্রীরা দুই বা ততোধিক পূর্ণ লোকসভা মেয়াদ অতিক্রম করেছেন—তবুও একবারও এই বিষয় নিয়ে সংবিধানের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়নি। এই **সাংবিধানিক নীরবতাই** হলো বর্তমান বিতর্কের মূল কেন্দ্রবিন্দু।

সংবিধান প্রণেতাদের উদ্দেশ্য বনাম বর্তমান বাস্তবতা

সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদের সীমাবদ্ধতা না রাখার সিদ্ধান্তটি ছিল সুচিন্তিত। **গণপরিষদ বিতর্কের (১৯৪৬–১৯৪৯)** সময় যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, প্রধানমন্ত্রীকে নির্দিষ্ট মেয়াদের চেয়েও কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়—আর তা হলো **প্রতিদিনের সংসদীয় জবাবদিহিতা**। তবে কয়েক দশকে এই যুক্তির ভিত্তি কাঠামোগতভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে।

ক. মূল যুক্তি: দৈনিক বনাম সাময়িক জবাবদিহিতা

- **ওয়েস্টমিনিস্টার মডেল:** ভারত ব্রিটেনের সংসদীয় ব্যবস্থা অনুসরণ করেছে, যেখানে প্রধানমন্ত্রী ততক্ষণই ক্ষমতায় থাকেন যতক্ষণ **আইনসভার আস্থা** বজায় থাকে। তাত্ত্বিকভাবে এটি নির্বাহী ক্ষমতার ওপর একটি **'দৈনিক নিয়ন্ত্রণ'** হিসেবে কাজ করে।
- **বি.আর. আম্বেদকরের পার্থক্য:** তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে, প্রধানমন্ত্রীর কেবল নির্বাচনের মাধ্যমে সাময়িক মূল্যায়ন নয়, বরং সংসদীয় পদ্ধতির মাধ্যমে **নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন** প্রয়োজন।
- **জবাবদিহিতার তিনটি হাতিয়ার:** প্রণেতারা তিনটি উপায়ের কথা ভেবেছিলেন: (ক) সংসদে প্রশ্ন ও সম্পূরক প্রশ্ন, (খ) মূলতবি প্রস্তাব ও জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিশ, এবং (গ) লোকসভায় **অনাস্থা প্রস্তাব**।
- **অভ্যন্তরীণ দলীয় নিয়ন্ত্রণ:** ব্রিটেন বা ওয়েস্টমিনিস্টার ব্যবস্থায় শাসক দলের সদস্যরা তাদের নেতাকে পদচ্যুত করতে পারেন (যেমন: মার্গারেট থ্যাচার বা বরিস জনসনের ক্ষেত্রে হয়েছে)। ভারতেও এমন **স্ব-সংশোধনকারী ব্যবস্থার** প্রত্যাশা করা হয়েছিল।

খ. কেন এই যুক্তি সময়ের সাথে দুর্বল হয়েছে?

- **আইনসভার ওপর নির্বাহীর আধিপত্য:** বাস্তবে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভাই এখন সংসদকে নিয়ন্ত্রণ করে। সংসদীয় অধিবেশন আগের চেয়ে ছোট হয়ে আসছে এবং **যথাযথ পর্যালোচনার (Scrutiny)** সুযোগ কমছে।
- **জোটগত জবাবদিহিতার পতন:** আগে কোয়ালিশন সরকার সমঝোতায় বাধ্য করত, কিন্তু বর্তমানে **একক দলের আধিপত্য** আইনসভার দরকষাকষির ক্ষমতা কমিয়ে দিয়েছে।
- **দলীয় গণতন্ত্রের অভাব:** ভারতের রাজনৈতিক দলগুলো অত্যন্ত **কেন্দ্রীভূত**, যেখানে ক্ষমতা কেবল শীর্ষ নেতৃত্বের হাতেই কুক্ষিগত থাকে।

দলত্যাগ বিরোধী আইন — যেভাবে জবাবদিহিতা ভেঙে পড়েছে

১৯৮৫ সালের ৫২তম সংশোধনীর মাধ্যমে প্রবর্তিত **দশম তফশিল (দলত্যাগ বিরোধী আইন)** সংসদীয় জবাবদিহিতার চিত্র বদলে দিয়েছে। রাজনৈতিক কেনাবেচা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে এটি তৈরি হলেও, এর একটি অনিচ্ছাকৃত নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে: এটি আইনপ্রণেতাদের পক্ষে নির্বাহী বিভাগকে জবাবদিহি করানো আইনত অসম্ভব করে তুলেছে।

ক. দলত্যাগ বিরোধী আইন কীভাবে কাজ করে

- **মূল নিয়ম:** কোনো আইনপ্রণেতা যদি দলের নির্দেশ বা **'হুইপ' (Whip)** অমান্য করে ভোট দেন বা অনুপস্থিত থাকেন, তবে তার সদস্যপদ খারিজ হতে পারে। এ ক্ষেত্রে স্পিকার বিচারকের ভূমিকা পালন করেন।
- **আয়া রাম গয়া রাম রাজনীতি:** ১৯৬৭-৮৫ সালের মধ্যে দলবদলের কারণে ঘনঘন সরকার পতনের সংস্কৃতি বন্ধ করতে এই আইন আনা হয়।
- **সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ:** 'কিহোটো হোল্লোহান বনাম জাচিলু' (১৯৯২) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট এই আইনকে বৈধ ঘোষণা করলেও জবাবদিহিতার ওপর এর প্রভাব নিয়ে প্রশ্ন থেকে গেছে।
- **অনিচ্ছাকৃত ফল:** শাসক দলের হাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে **অনাস্থা প্রস্তাব** এখন কেবল একটি আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়েছে।

খ. আনুগত্যের 'ডাবল লক' (Double Lock)

এই ব্যবস্থার ফলে নির্বাহী বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে:

- **লক ১ — দলের প্রতি বাধ্যবাধকতা:** দলত্যাগ বিরোধী আইনের ভয়ে সংসদ সদস্যরা কোনও আস্থার ভোটে নিজের বিবেক অনুযায়ী ভোট দিতে পারেন না।
- **লক ২ — নেতার প্রতি দলের বাধ্যবাধকতা:** দলে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র না থাকায় সদস্যরা তাদের নেতাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন না। ফলে নেতা দলের ভেতরে ও বাইরে—উভয় দিক থেকেই **অপরাজেয়** হয়ে ওঠেন।
- **ব্রিটেনের সাথে বৈপরীত্য:** ব্রিটেনে দলত্যাগ বিরোধী আইন নেই, তাই সেখানে দলের সদস্যরাই প্রধানমন্ত্রীকে সরাতে পারেন। ভারতের ব্যবস্থায় এই **অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতার অভাব** রয়েছে।

তথ্যচিত্র (Data Point): ১৯৪৮ থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে ভারতে ৩২টি অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৮৫ সালের পর, লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা কোনও সরকারই অনাস্থা ভোটে হারেনি। সর্বশেষ সফল অনাস্থা ভোট ছিল ১৯৭৯ সালে (জনতা পার্টি সরকার)।

গণতান্ত্রিক জনাদেশ বিশ্লেষণ: নির্বাচনী বৈধতার সীমাবদ্ধতা

মেয়াদের সীমাবদ্ধতা (Term Limits) আরোপের বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী যুক্তিটি হলো: যদি ভোটাররা বারবার একই নেতাকে বেছে নেন, তবে সংবিধান কেন তাঁদের সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করবে? এই বিতর্কের গভীরে গেলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উন্মোচিত হয়:

- **ভোটারদের সার্বভৌমত্ব (Voter Sovereignty):** বারবার নির্বাচনী জয় সংখ্যাগরিষ্ঠের **গণতান্ত্রিক ইচ্ছারই** প্রতিফলন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, মেয়াদের সীমা নির্ধারণ করা একটি অভিভাবকসুলভ (Paternalistic) বা জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্ত।
- **নির্বাচনের ওপর অতিরিক্ত চাপ:** যখন দৈনন্দিন সংসদীয় জবাবদিহিতা ভেঙে পড়ে, তখন **নির্বাচনই** হয়ে ওঠে একমাত্র নিয়ন্ত্রক। পাঁচ বছরে মাত্র একবার ঘটা একটি প্রক্রিয়ার পক্ষে শাসনব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা এক অবাস্তব প্রত্যাশা।
- **অসম নির্বাচনী ক্ষেত্র (Unequal Playing Field):** দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকলে রাষ্ট্রীয় সম্পদ, সংবাদমাধ্যমের ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং সুযোগ-সুবিধা বণ্টনের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে **ক্ষমতাসীন দল (Incumbency)** অতিরিক্ত সুবিধা পায়। একটি অসম বা পক্ষপাতদুষ্ট ক্ষেত্রে নেওয়া 'মুক্ত পছন্দ' প্রকৃত অর্থে স্বাধীন হতে পারে না।
- **সাংবিধানিক সুরক্ষা বনাম গণতন্ত্র:** ফরীদ জাকারিয়া যুক্তি দিয়েছেন যে, "সাংবিধানিক উদারনীতি ছাড়া গণতন্ত্র অনুদার ফলাফল (Illiberal Outcomes) তৈরি করতে পারে।" মেয়াদের সীমাবদ্ধতা গণতন্ত্রের ওপর কোনো বাধা নয়—বরং এটি গণতন্ত্রের **সুরক্ষাকবচ বা স্থাপত্য (Architecture)**।

দীর্ঘস্থায়ী শাসনকাল থেকে উদ্ভূত প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

যখন নির্বাহী ক্ষমতা কোনও আনুষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ছাড়াই একটি নির্দিষ্ট পদে কেন্দ্রীভূত হয়, তখন সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞরা চারটি প্রধান **প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকির** (Institutional Risks) কথা উল্লেখ করেন:

- **গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগের ওপর নিয়ন্ত্রণ:** দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষমতায় থাকা সরকার নির্বাচন কমিশন, **উচ্চতর বিচার বিভাগ**, সিএজি (CAG), এবং কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলোর নিয়োগ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। এটি ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠানের নিরপেক্ষতাকে নষ্ট করে।
- **তথ্য পরিবেশের ওপর আধিপত্য:** দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকলে সরকার মিডিয়া লাইসেন্সিং এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে **তথ্য প্রবাহকে** (Information Environment) নিজের অনুকূলে নিয়ে আসতে পারে।
- **ক্রমপুঞ্জিত প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষয়:** আইন বিশেষজ্ঞ টম গিন্সবার্গ এবং আজিজ হুক-এর মতে, গণতন্ত্রের পতন হঠাৎ কোনও অভ্যুত্থানের মাধ্যমে হয় না; এটি হয় প্রতিষ্ঠানের **ধীর গতির ক্ষয় বা ক্ষয়িষ্ণুতার** (Incremental Erosion) মাধ্যমে।
- **আমলাতান্ত্রিক পরিবর্তন:** সময়ের সাথে সাথে সিভিল সার্ভিস বা আমলারা একটি নির্দিষ্ট নেতৃত্বশৈলীর প্রতি অনুগত হয়ে পড়ে। তারা প্রাতিষ্ঠানিক নিরপেক্ষতার চেয়ে **রাজনৈতিক আনুগত্যকে** বেশি গুরুত্ব দিতে শুরু করে।
- **ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের স্বাভাবিকীকরণ:** দীর্ঘ শাসনের ফলে নাগরিকরা ক্ষমতার এই অসীম কেন্দ্রীকরণকেই 'স্বাভাবিক' বলে ধরে নেয়। একে **'বলিং ফ্রগ'** (Boiling Frog) প্রভাব বলা হয়, যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষতি এতটাই ধীরগতিতে হয় যে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের আগে তা ধরা পড়ে না।

বৈশ্বিক সর্বোত্তম অনুশীলন — অন্যান্য গণতন্ত্র যেভাবে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে

বড় গণতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্যে ভারত একটি **ব্যতিক্রমী** (Outlier) উদাহরণ, কারণ এখানে প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদের ওপর কোনও আনুষ্ঠানিক বা প্রথাগত সীমাবদ্ধতা নেই। বৈশ্বিক ঐকমত্য এটাই যে: অসীম নির্বাহী ক্ষমতা **কাঠামোগত ঝুঁকি** বহন করে।

ক. আনুষ্ঠানিক মেয়াদের সীমা থাকা রাষ্ট্রপতি শাসিত প্রজাতন্ত্র

- **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র — দুই মেয়াদ (১৯৫১ সালের ২২তম সংশোধনী):** ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্টের টানা চারবার মেয়াদের পর, মার্কিন সংবিধানে রাষ্ট্রপতির মেয়াদ সর্বোচ্চ **দুইটি চার বছরের মেয়াদে** সীমাবদ্ধ করা হয়।
- **দক্ষিণ কোরিয়া — একটি মাত্র ৫ বছরের মেয়াদ:** এটি বিশ্বের অন্যতম কঠোর ব্যবস্থা, যা বিশেষভাবে ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তির **পদের অপব্যবহার** রোধ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে।
- **ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া, কলম্বিয়া:** এই তিনটি বড় গণতান্ত্রিক দেশই নির্বাহী বিভাগের অতিরিক্ত ক্ষমতা চর্চার ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে **দুই মেয়াদ বা এক মেয়াদের** সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছে।

খ. সংসদীয় ব্যবস্থা এবং অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতা

- **যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা — দলীয় নিয়ন্ত্রণ:** এই ওয়েস্টমিনিস্টার ব্যবস্থাগুলোতে আনুষ্ঠানিক মেয়াদের সীমা না থাকলেও, নেতাদের সরানোর জন্য **শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ দলীয় গণতন্ত্রের** ওপর নির্ভর করা হয়। ভারতের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন দলীয় সংস্কৃতিতে এই ব্যবস্থাটি অনুপস্থিত।

ভারত কেন আলাদা: ভারতে মেয়াদের কোনও সীমা নেই, দলের ভেতরে গণতন্ত্র নেই এবং **দলত্যাগ বিরোধী আইন** সংসদীয় জবাবদিহিতাকে রুদ্ধ করে দিয়েছে। এই তিনটির অভাব ভারতের পরিস্থিতিকে আরও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে।

আগামীর পথ — সাংবিধানিক ক্ষমতার ভারসাম্য পুনরুদ্ধার

- **দলত্যাগ বিরোধী আইনের (দশম তফশিল) সংস্কার:** অনাস্থা প্রস্তাবের মতো গুরুত্বপূর্ণ ভোটাভুটিতে সাংসদদের ওপর থেকে 'অযোগ্যতা'র ভয় সরিয়ে নিতে হবে। এতে সাংসদরা দলের চাপের বদলে নিজস্ব **বিবেক ও বিচারবুদ্ধি** প্রয়োগ করে সরকারকে জবাবদিহি করতে পারবেন।

- **নির্বাহী পদের মেয়াদের সীমাবদ্ধতা:** প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীদের জন্য **টানা দুই মেয়াদের** সীমাবদ্ধতা এবং নির্দিষ্ট সময়ের বিরতি (Cooling-off period) প্রবর্তন করা উচিত। এটি ক্ষমতার অতিরিক্ত কেন্দ্রীকরণ রোধ করবে এবং নতুন নেতৃত্বের সুযোগ তৈরি করবে।
- **অভ্যন্তরীণ দলীয় গণতন্ত্র শক্তিশালীকরণ:** 'জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১' সংশোধন করে রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরে **নির্বাচন কমিশন**-এর তত্ত্বাবধানে নিয়মিত অভ্যন্তরীণ নির্বাচন বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- **রাজনৈতিক দলে স্বচ্ছতা:** দলগুলোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং অভ্যন্তরীণ নির্বাচনের ফলাফল জনসমক্ষে প্রকাশ করা উচিত। এটি জনগণের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করবে।
- **সংসদীয় কার্যক্রমের পুনরুজ্জীবন:** সংসদের জন্য **ন্যূনতম কার্যদিবস** নিশ্চিত করা এবং 'ডিপার্টমেন্টাল স্ট্যান্ডিং কমিটি'গুলোকে আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন যাতে তারা নির্বাহী বিভাগের কাজের সঠিক তদারকি করতে পারে।
- **সাংবিধানিক নৈতিকতার প্রসার:** ডঃ বি.আর. আম্বেদকরের দর্শনে **সাংবিধানিক নৈতিকতা (Constitutional Morality)** চর্চা বাড়াতে হবে। ক্ষমতার প্রয়োগ যেন কেবল ব্যক্তিগত আধিপত্য নয়, বরং জনকল্যাণের মাধ্যম হিসেবে হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

উপসংহার

টানা ৮,৯৩১ দিনের শাসনের এই রেকর্ডটি ভারতের জন্য একটি 'ওয়েক-আপ কল' বা সতর্কবার্তা। সীমাবদ্ধ ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রপতি এবং অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন প্রধানমন্ত্রীর পদের মধ্যে যে ব্যবধান, তা ঘোচানোর সময় এসেছে। প্রজাতন্ত্রের শক্তি কোনও নেতার জনপ্রিয়তার ওপর নয়, বরং **প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতার** ওপর নির্ভর করে।

"সাংবিধানিক নৈতিকতা কোনও সহজাত অনুভূতি নয়। এটিকে লালন করতে হয়। ভারতে গণতন্ত্র হলো ভারতীয় মাটির ওপর কেবলমাত্র একটি আলগা আস্তরণ, যেখানে মাটির গভীরের প্রকৃতি মূলত অগণতান্ত্রিক।" — **ডঃ বি.আর. আম্বেদকর**

Q. The absence of term limits for the Prime Minister, combined with weakened parliamentary accountability, creates a structural imbalance in India's constitutional framework. Critically examine. 15 Marks

1.1.4. পরিচয়ের বিবর্তন: 'কেরল' থেকে 'কেরলম' নামকরণের ব্যবচ্ছেদ

ভূমিকা

কেরল রাজ্যকে **'কেরলম'** (Keralam) হিসেবে পুনর্নবীকরণের প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক অনুমোদন এই শব্দটির **ঐতিহাসিকতা** (Historicity) নিয়ে নতুন করে পর্যালোচনার সুযোগ করে দিয়েছে। এই উন্নয়ন মূলত মৌলিক পৌরাণিক কাহিনী, **আইক্য কেরল আন্দোলনের** (United Kerala Movement) উত্তরাধিকার এবং সমসাময়িক **ভাষাগত বিশুদ্ধতার** (Linguistic purity) তাগিদকে স্পর্শ করে।

পরিচয়ের বিবর্তন: 'কেরল' থেকে 'কেরলম'

'কেরল' থেকে 'কেরলম'-এ এই উত্তরণ কেবল নামকরণের পরিবর্তন নয়, বরং এটি **পৌরাণিক কাহিনী, ভাষাগত বিবর্তন** এবং **রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার** দ্বারা গঠিত একটি ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতাকে প্রতিফলিত করে। এটি দেখায় যে কীভাবে সময়ের সাথে সাথে পরিচয় **নির্মিত** এবং **পুনর্ব্যাখ্যা** করা হয়েছে।

I. প্রাচীন ভিত্তি: পৌরাণিক কাহিনী এবং প্রাথমিক প্রমাণ

১. পৌরাণিক উৎস

- **কেরলোৎপত্তি** (Keralolpatti) অনুসারে, বিশ্বাস করা হয় যে ভগবান বিষ্ণুর অবতার **পরশুরাম** সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে এই ভূমি সৃষ্টি করেছিলেন।
- পৌরাণিক কাহিনীতে এই অঞ্চলটি **গোকর্ণম** থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত বলে বর্ণনা করা হয়েছে।
- গুরুত্বপূর্ণভাবে, এই গ্রন্থগুলোতে **'কেরল'** এবং **'কেরলম'** উভয় শব্দই **পরস্পর পরিবর্তনযোগ্যভাবে** (Interchangeably) ব্যবহৃত হয়েছে, যা নির্দেশ করে যে কোনো একটি শব্দেরই একচেটিয়া ঐতিহাসিক প্রাধান্য ছিল না।

২. ভাষাগত ও ঐতিহাসিক শিকড়

- নামটি **'কেরম'** (নারকেল গাছ) থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যা এই অঞ্চলকে **"নারকেল গাছের দেশ"** হিসেবে প্রতীকায়িত করে।
- হারমান গুন্ডার্টের মালয়ালম অভিধানে (১৮৭২) **কেরল** এবং **কেরলম** উভয়কেই সমান বৈধ রূপ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।
- **অশোকের শিলালিপিতে** 'কেরলপুত্র' (Keralaputra) শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা 'কেরল' শব্দটির **প্রাচীন ব্যবহার এবং ঐতিহাসিক বৈধতা** নিশ্চিত করে।

II. ১৯৫৬-পূর্ব পর্যায়: খণ্ডিত রাজনৈতিক পরিচয়

১. রাজনৈতিক কাঠামো স্বাধীনতার আগে এই অঞ্চলটি ঐক্যবদ্ধ ছিল না, বরং তিনটি অংশে বিভক্ত ছিল:

- **ত্রিবাঙ্কুর** (Travancore)
- **কোচিন** (Cochin)
- **মালাবার** (ব্রিটিশ শাসনের অধীনে) অর্থাৎ, একটি একক রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে **কেরলের কোনো অস্তিত্ব ছিল না**।

২. ভাষাগত ও সামাজিক জটিলতা

- ত্রিবাঙ্কুরে বিশেষ করে দক্ষিণ অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য **তামিলভাষী জনসংখ্যা** ছিল।
- প্রশাসন ও সমাজে ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে **মালয়ালি পরিচয় রাজনীতির** উত্থান ঘটে।
- সামাজিক স্তরবিন্যাস (যেমন: **পট্টর** বনাম **নম্বুদিরি**) গোষ্ঠীবদ্ধ পার্থক্য এবং পরিচয় গঠনে প্রভাব ফেলেছিল।

৩. স্বাধীনতার পরবর্তী অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

- **সি. পি. রামস্বামী আইয়ারের** অধীনে, ত্রিবাঙ্কুর ১৯৪৭ সালে একটি **স্বাধীন রাষ্ট্র** হিসেবে থাকার কথা বিবেচনা করেছিল।
- মুঘল এবং ইউরোপীয় বিজয় থেকে ত্রিবাঙ্কুরের **ঐতিহাসিক স্বায়ত্তশাসনকে** এই দাবির ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল, যা তৎকালীন খণ্ডিত ও অনিশ্চিত রাজনৈতিক ভবিষ্যতের প্রতিফলন।

III. আইক্য কেরল আন্দোলন: ভাষাগত জাতিসত্তা

১. **ভাষার ভিত্তি আইক্য কেরল আন্দোলন** পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক ভূগোলের পরিবর্তে **মালয়ালম ভাষাগত ঐক্যকে** রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি হিসেবে জোর দিয়েছিল। ফলে পরিচয় হয়ে ওঠে **জনগণ-কেন্দ্রিক এবং ভাষা-চালিত**।

২. **নমনীয় নামকরণ** তৎকালীন আলোচনায় **'আইক্য কেরল'** এবং **'আইক্য কেরলম'** উভয়ই অবাধে ব্যবহৃত হতো, যা নির্দেশ করে যে সেই সময়ে নামকরণ নিয়ে কোনো **রাজনৈতিক বিতর্ক ছিল না**।

৩. বাস্তববাদী আঞ্চলিক সিদ্ধান্ত

- পৌরাণিক দাবি সত্ত্বেও, প্রধানত **তামিলভাষী অধ্যুষিত** হওয়ায় কন্যাকুমারী এই রাজ্য থেকে বাদ পড়েছিল।

- এটি ঐতিহ্যের চেয়ে **ভাষাগত অভিন্নতাকে** (Linguistic homogeneity) অগ্রাধিকার দেওয়ার একটি **বাস্তববাদী ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি** তুলে ধরে।

৪. **সাংবিধানিক ফলাফল রাজ্য পুনর্গঠন আইন, ১৯৫৬**-এর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে এই রাজ্যটি গঠিত হয়। ভারতের সংবিধানে **"কেরল"** (Kerala) নামটি গৃহীত হয়, যা বর্তমান নামকরণের বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে।

IV. **আধুনিক সংহতি: অভিন্ন রাজনৈতিক চেতনা**

১. **আন্তঃ-আঞ্চলিক ঐক্য** ঔপনিবেশিক বিরোধী সংগ্রাম, বহিরাগত আধিপত্যের প্রতিরোধ এবং **জাতীয়তাবাদ ও কমিউনিজমের** উত্থান ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন এবং মালাবারের মধ্যকার বিভাজন দূর করতে সাহায্য করেছিল। এই শক্তিগুলো একটি **অভিন্ন আঞ্চলিক চেতনা** গড়ে তোলে।

২. **রাজনৈতিক সংহতি** বিভিন্ন অঞ্চলে রাজনৈতিক আন্দোলন এবং তৃণমূল পর্যায়ের **গণ-সংহতি** (Mobilisation) ধীরে ধীরে ঐতিহাসিক খণ্ডিত অবস্থাকে কাটিয়ে ওঠে। এটি ঐতিহাসিক সীমানা ছাড়িয়ে একটি বৃহত্তর **মালয়ালি পরিচয়** বা সত্তার একীকরণ ঘটায়।

সাংবিধানিক পদ্ধতি: ভারতে একটি রাজ্যের নামকরণ যেভাবে পরিবর্তন করা হয়

ভারতে একটি রাজ্যের নাম পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটি একটি **সুশৃঙ্খল সাংবিধানিক অনুশীলন**, যা ভারতীয় সংবিধানের **৩ নম্বর অনুচ্ছেদ (Article 3)** দ্বারা পরিচালিত হয়। এই অনুচ্ছেদ **সংসদকে (Parliament)** যেকোনো রাজ্যের **নাম, এলাকা বা সীমানা** পরিবর্তনের ক্ষমতা প্রদান করে।

- **রাজ্য আইনসভা কর্তৃক উদ্যোগ:** নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব সংবলিত একটি **আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব (Formal Resolution)** সংশ্লিষ্ট **রাজ্য বিধানসভায় পাস** করা হয় এবং এরপর তা **কেন্দ্রীয় সরকারের** কাছে পাঠানো হয়।
- **স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক (MHA) কর্তৃক যাচাই:** স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক প্রস্তাবটি পরীক্ষা করে এবং সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি, যেমন— **ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (IB), ডাক বিভাগ** এবং **সার্ভে অফ ইন্ডিয়া**-র কাছ থেকে **'অনাপত্তি শংসাপত্র' (NOC)** সংগ্রহ করে।
- **রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাজ্য আইনসভায় প্রেরণ:** ভারতের **রাষ্ট্রপতি** বিলটি সংশ্লিষ্ট রাজ্য আইনসভার কাছে তাদের **মতামত** জানার জন্য পাঠান। এই মতামতগুলি কেবল **পরামর্শমূলক** এবং সংসদের ওপর তা **বাধ্যতামূলক নয়**।
- **সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সংসদীয় অনুমোদন:** সংসদে একটি বিল পেশ করা হয় এবং উভয় কক্ষে তা **সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় (Simple Majority)** পাস হয়। এর জন্য কোনো বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা অন্য রাজ্যগুলির অনুমোদনের **প্রয়োজন হয় না**, যা রাজ্যের নাম পরিবর্তনকে একটি তুলনামূলক **সহজ আইনি প্রক্রিয়া** হিসেবে গণ্য করে।
- **রাষ্ট্রপতির সম্মতি ও সাংবিধানিক সংশোধন:** রাষ্ট্রপতির **সম্মতি** পাওয়ার পর, নতুন নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সংবিধানের **প্রথম তফসিল (First Schedule)** আনুষ্ঠানিকভাবে সংশোধন করা হয়।
- **রাজ্য কর্তৃক প্রশাসনিক হালনাগাদ:** এরপর রাজ্যের **প্রশাসনিক ব্যবস্থা** তাদের **অফিসিয়াল সিল, গেজেট, ডিজিটাল ডেটাবেস, আইনি নথি, শিক্ষাসামগ্রী** এবং **জনসাধারণের জন্য নির্দেশিকা বা সাইনবোর্ডগুলো** পরিবর্তনের কাজ শুরু করে।

কেরল থেকে 'কেরলম' নামকরণের প্রভাব

ইংরেজি ধাঁচের 'কেরল' (Kerala) থেকে ধ্বনিগতভাবে স্থানীয় **'কেরলম' (Keralam)** নামটিতে স্থানান্তরের প্রস্তাবের গভীর প্রভাব রয়েছে।

১. **ইতিবাচক প্রভাব: সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত পুনরুত্থান**

- **ভাষাগত বিশুদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতা:** এর মূল উদ্দেশ্য হলো সরকারি ইংরেজি নামটিকে **মালয়ালম উচ্চারণের** সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা। এটি নামের শেষে **'-অম' (-am)** প্রত্যয় যুক্ত করে **দ্রাবিড় ভাষাগত বৈশিষ্ট্যকে** সম্মান জানায়, যা এই ভাষার ধ্বনিগত কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

- **নামকরণের ঔপনিবেশিকতা মুক্তি (Decolonization):** রাজ্যটির নাম 'কেরলম' হিসেবে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করাকে **সাংস্কৃতিক ঔপনিবেশিকতা মুক্তির** একটি পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হয়। এটি ঔপনিবেশিক আমলে চাপিয়ে দেওয়া বা জনপ্রিয় হওয়া ইংরেজি রূপ থেকে সরে এসে রাজ্যের নামকরণের ওপর **দেশীয় সার্বভৌমত্ব** প্রতিষ্ঠা করে।
- **আঞ্চলিক গর্ব বৃদ্ধি:** মাতৃভাষায় প্রচলিত নামটি গ্রহণ করার মাধ্যমে সরকার **আঞ্চলিক একাত্মতা** এবং **মালয়ালি পরিচয়ের** বোধকে আরও সুদৃঢ় করে। এটি ১৯৫৬ সালের **ভাষাসমূহ পুনর্গঠনের (Linguistic Reorganization)** মূল চেতনাকে প্রতিফলিত করে।
- **প্রতীকী ঐক্য:** এটি রাজ্যের **দাপ্তরিক ভাষা (মালয়ালম)** এবং **সাংবিধানিক পরিচয়ের** মধ্যে ব্যবধান দূর করে। এর ফলে স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে একটি **অভিন্ন পরিচয়** তৈরি হয়।

২. **নেতিবাচক প্রভাব: প্রশাসনিক ও আর্থিক সীমাবদ্ধতা**

- **বিশাল আর্থিক বোঝা:** একটি রাজ্যের নাম পরিবর্তন করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল কাজ। ধারণা করা হচ্ছে, এর খরচ **কয়েকশ কোটি টাকা** ছাড়িয়ে যেতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে **ভূমি রেকর্ড, পরিচয়পত্র** (আধার, ভোটার কার্ড, পাসপোর্ট), **সরকারি স্টেশনারি** এবং **দাপ্তরিক সিল** পরিবর্তন।
- **লজিস্টিক ও প্রশাসনিক জটিলতা:** সমস্ত **ডিজিটাল ডেটাবেস** এবং **জাতীয় রেজিস্ট্রি** জুড়ে ব্যাপক পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। রেল স্টেশন, **পোস্টাল কোড** এবং **এয়ারপোর্ট কোড** পরিবর্তনের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রকগুলির (রেলওয়ে, ডাক বিভাগ, বেসামরিক বিমান পরিবহন) সঙ্গে সমন্বয় করা বাধ্যতামূলক, যা সাময়িকভাবে **প্রশাসনিক বিভ্রান্তি** তৈরি করতে পারে।
- **ব্র্যান্ড ভ্যালু ও বৈশ্বিক পরিচিতি:** পর্যটন (God's Own Country) এবং **আয়ুর্বেদ** ক্ষেত্রে 'কেরল' (Kerala) একটি অত্যন্ত শক্তিশালী **গ্লোবাল ব্র্যান্ড**। আন্তর্জাতিকভাবে 'কেরলম' (Keralam) নামে পরিবর্তন করলে **ব্র্যান্ডের গ্রহণযোগ্যতা** কমে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। বিশ্বজুড়ে মানুষ যাতে নতুন নামটিকে একই সত্তা হিসেবে চিনতে পারে, তার জন্য একটি বড় অঙ্কের **বিপণন বাজেট (Marketing Budget)** প্রয়োজন হবে।
- **ঐতিহাসিক অস্পষ্টতা:** সমালোচকরা উল্লেখ করেন যে, প্রাচীন গ্রন্থ **'কেরলোৎপত্তি'** এবং **'অশোকের শিলালিপিতে'** 'কেরল' এবং 'কেরলম' উভয় শব্দই **একে অপরের পরিপূরক (Interchangeably)** হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই একটি শব্দ অন্যটির চেয়ে বেশি **'নির্ভরযোগ্য'** কি না, তা নিয়ে **তাত্ত্বিক বিতর্ক** থেকেই যায়।
- **সংখ্যালঘুদের সামাজিক-রাজনৈতিক সংহতি:** এই নাম পরিবর্তনের একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো **ভাষাগত সংখ্যালঘুদের** মর্যাদা রক্ষা করা। মালয়ালম ভাষার বিশুদ্ধতা উদযাপন করার সময় রাজ্যকে নিশ্চিত করতে হবে যেন তা অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো **ভাষাগত আধিপত্যবাদের (Majoritarianism)** বার্তা না দেয়। সীমানা অঞ্চলের **তামিল ও কন্নড়ভাষী** জনগোষ্ঠী যাতে এই পরিবর্তনের ফলে নিজেদের বিচ্ছিন্ন মনে না করে, তার জন্য নীতিনির্ধারকদের সতর্ক ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

বৈশ্বিক শিক্ষা: নাম পরিবর্তনের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা

একটি দেশের বা রাজ্যের নাম পরিবর্তন মূলত **সাংস্কৃতিক পরিচয় পুনরুদ্ধার** এবং **ঔপনিবেশিক তকমা** বর্জনের একটি বৈশ্বিক প্রবণতা।

- **তুরস্ক থেকে তুর্কিয়ে (২০২২):** বিশ্বমঞ্চে **জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিচয়** তুলে ধরতে এবং ইংরেজি শব্দের অপ্রীতিকর অর্থ দূর করতে এই পরিবর্তন করা হয়। এটি **জাতিসংঘের অনুমোদন** এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রচারণার মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- **সোয়াজিল্যান্ড থেকে এসওয়াতিনি (২০১৮): ঔপনিবেশিকতা-পরবর্তী পুনরুদ্ধার** হিসেবে প্রাক-ঔপনিবেশিক আদি নাম ফিরিয়ে আনা হয়, যা আন্তর্জাতিকভাবে দ্রুত গ্রহণযোগ্যতা পায়।
- **ভারতের উদাহরণ:** ওড়িশা (Odisha, ২০১১), উত্তরাখণ্ড (Uttarakhand, ২০০৬) এবং পুদুচেরি (Puducherry, ২০০৬) এর নাম পরিবর্তন **সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বিশুদ্ধতার** সফল দৃষ্টান্ত।

- **শহরের নাম পরিবর্তন:** বোম্বাই থেকে **মুম্বাই**, মাদ্রাজ থেকে **চেন্নাই** এবং ক্যালকাটা থেকে **কলকাতা**—এই পরিবর্তনগুলো প্রমাণ করে যে **প্রশাসনিক সমন্বয়ে** সময় লাগলেও দেশীয় নাম বিশ্বজুড়ে স্বাভাবিকভাবে গৃহীত হয়।
- **মূল শিক্ষা:** সফল নামকরণের জন্য কেবল রাজনৈতিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নয়, বরং **সামাজিক ঐকমত্য**, শক্তিশালী **সাংস্কৃতিক যুক্তি** এবং সুপরিকল্পিত **যোগাযোগ কৌশল** প্রয়োজন।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ: একটি কৌশলগত রোডম্যাপ

- **সামাজিক ঐকমত্য:** নাম পরিবর্তনের আগে রাজনৈতিক দল, **ভাষাগত সংখ্যালঘু** এবং সুশীল সমাজের সাথে **সার্থক আলোচনা** করা উচিত যাতে এটি সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থের ঊর্ধ্বে থাকে।
- **প্রাতিষ্ঠানিক বাস্তবায়ন:** আইনি নথি, ডেটাবেস এবং **ডাক কোড** হালনাগাদ করার জন্য একটি **কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ ব্যবস্থা** থাকা প্রয়োজন যাতে প্রশাসনিক বিঘ্ন সর্বনিম্ন হয়।
- **অন্তর্ভুক্তিমূলক ফেডারেলিজম:** এই প্রক্রিয়াকে **সাংস্কৃতিক ডিকলোনাইজেশন** হিসেবে দেখা উচিত, তবে তা যেন সংখ্যালঘুদের মনে কোনো শঙ্কা তৈরি না করে।
- **ব্র্যান্ড ভ্যালু রক্ষা:** নাম পরিবর্তনের আগে পর্যটন ও বিনিয়োগের ওপর **প্রভাব মূল্যায়ন** করা এবং পুরনো ইতিবাচক ভাবমূর্তি বজায় রেখে ধীরে ধীরে নতুন নাম প্রতিষ্ঠিত করা জরুরি।
- **শিক্ষা ও সচেতনতা:** বিবর্তনশীল আঞ্চলিক পরিচয় ব্যাখ্যা করতে এই পরিবর্তনগুলো **শিক্ষা পাঠ্যক্রমে** অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।
- **স্বচ্ছ মানদণ্ড:** ভবিষ্যতের জন্য কেন্দ্রকে একটি **নিরপেক্ষ মানদণ্ড** তৈরি করতে হবে যা **ঐতিহাসিক বৈধতা** এবং প্রশাসনিক সক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে কাজ করবে।

উপসংহার

কেরল থেকে **'কেরলম'** নামকরণ একটি জীবন্ত গণতন্ত্রের পরিচয় পুনর্নির্ধারণের ক্ষমতার প্রতিফলন। তবে ঐতিহাসিক নথি অনুযায়ী উভয় শব্দেরই **সমান বৈধতা** রয়েছে। চূড়ান্তভাবে, এই উত্তরণটি ইতিহাসের খণ্ডিত পাঠের পরিবর্তে **প্রকৃত সাংস্কৃতিক ভিত্তি** এবং **অন্তর্ভুক্তিমূলক বাস্তবায়নের** মাধ্যমে হওয়া উচিত, যা **গণতান্ত্রিক ঐকমত্যের গুণমান** বজায় রাখে।

Q. Identity-driven changes like state renaming can test the stability of India's federal structure by encouraging similar demands. Critically examine. 15 Marks

1.1.5. ভারতে হেপাজতি সহিংসতা (CUSTODIAL VIOLENCE): এক পদ্ধতিগত বিচার

প্রেক্ষাপট

সাম্প্রতিক **সাথানকুলাম হেপাজতি মৃত্যু মামলায়** একাধিক পুলিশ কর্মীর সাজা হওয়ার ঘটনাটি বিচারবিভাগীয় জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। শক্তিশালী ফরেনসিক এবং সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে এই রায় দেওয়া হয়েছে। এটি কেবল পুলিশি ব্যবস্থা ও তদারকির গভীর পদ্ধতিগত ব্যর্থতাকেই প্রকাশ করে না, বরং সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা এবং ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে বিচার বিভাগের ভূমিকাকে আরও শক্তিশালী করে।

হেপাজতি সহিংসতা (Custodial Violence) কী?

হেপাজতি সহিংসতা বলতে পুলিশ বা বিচারবিভাগীয় হেপাজতে থাকা কোনো ব্যক্তির ওপর যেকোনো ধরনের শারীরিক বা মানসিক আঘাত করাকে বোঝায়। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

- **শারীরিক নির্যাতন** যেমন মারধর এবং আক্রমণ।
- **মানসিক নির্যাতন** যার মধ্যে রয়েছে ভয় দেখানো এবং অপমান করা।
- **যৌন সহিংসতা**।
- **হেপাজতি মৃত্যু** (Custodial deaths)। বেআইনি এবং মৌলিক অধিকার পরিপন্থী হওয়া সত্ত্বেও, অনেক সময় অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের দ্বারা এই জাতীয় কাজগুলোকে স্বীকারোক্তি আদায় বা শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বলে যুক্তি দেওয়া হয়।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

ভারতে হেপাজতি সহিংসতার শিকড় অনেক গভীরে এবং বিভিন্ন যুগে এর ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়।

১. **প্রাচীন ভারত** কৌটিল্যের **অর্থশাস্ত্রের** মতো গ্রন্থে অঙ্গহানি, পুড়িয়ে মারা এবং এমনকি পশুর মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ডের মতো কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায়। শাস্তি ছিল মূলত অপরাধ দমনের উদ্দেশ্যে, যেখানে ব্যক্তিগত অধিকারের গুরুত্ব ছিল অত্যন্ত সীমিত।

২. **মধ্যযুগ** মুঘল আমলে বিচার ব্যবস্থা ইসলামী আইন (**শরিয়ত**) দ্বারা প্রভাবিত ছিল। বেত্রাঘাত এবং শারীরিক বলপ্রয়োগের মতো কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থাগুলি আইন প্রয়োগের সরঞ্জাম হিসাবে সাধারণ ছিল।

৩. **ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমল** ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র বলপ্রয়োগকারী পুলিশি ব্যবস্থাকে **প্রাতিষ্ঠানিক রূপ** দিয়েছিল:

- **১৮৬১ সালের পুলিশ আইন** এমন একটি বাহিনী তৈরি করেছিল যার প্রধান কাজ ছিল জনগণের সেবা নয়, বরং **দমন ও নিয়ন্ত্রণ** করা।
- রাজনৈতিক বন্দি এবং সাধারণ কয়েদিদের প্রায়ই মারধর, অনাহার এবং নৃশংস শাস্তির সম্মুখীন হতে হতো।
- **১৮৯৪ সালের কারাগার আইন** জেল কর্তৃপক্ষকে ব্যাপক স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রদান করেছিল, যার অনেকগুলো আজও কারাগার প্রশাসনকে প্রভাবিত করছে। এই সময়টি জবাবদিহিতাহীন এক আধিপত্যবাদী সংস্কৃতি তৈরি করেছিল।

৪. **স্বাধীনতা-পরবর্তী আমল** ১৯৪৭ সালের পর ভারত মূলত তার **ঔপনিবেশিক পুলিশি এবং কারাগার কাঠামো** বজায় রাখে:

- পুলিশ ও কারাগার প্রশাসনে সংস্কার ছিল অত্যন্ত সীমিত।
- বলপ্রয়োগকারী এবং শ্রেণিবিন্যাসগত মানসিকতা বজায় থাকে।
- দুর্বল জবাবদিহিতা ব্যবস্থা এবং সেকেলে আইন। সাংবিধানিক নিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও, পদ্ধতিগত স্থবিরতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক আধুনিকীকরণের অভাবে হেপাজতি সহিংসতা চলতেই থাকে।

আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা কবচ

১. **সাংবিধানিক বিধান**

- **অনুচ্ছেদ ২১:** জীবন এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার।
- **অনুচ্ছেদ ২০(৩):** নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া থেকে সুরক্ষা।
- **অনুচ্ছেদ ২২:** খেয়ালখুশি মতো গ্রেপ্তার থেকে সুরক্ষা।

২. **বিচারবিভাগীয় সুরক্ষা**

- **ডি.কে. বসু বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য:** গ্রেপ্তার এবং আটকের জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশিকা।
- **নীলাবতী বেহেরা বনাম ওড়িশা রাজ্য:** ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত বিচারিক আইন।

৩. **সংবিধিবদ্ধ সুরক্ষা**

- মারধর এবং নরহত্যার বিরুদ্ধে আইপিসি (IPC)-র বিধান।
- গ্রেপ্তারের সময় সিআরপিসি (CrPC)-র সুরক্ষা কবচ।
- জোরপূর্বক আদায় করা স্বীকারোক্তিকে সাক্ষ্য আইন অনুযায়ী বাতিল করা।

হেপাজতি সহিংসতার ফলাফল

১. **মানবাধিকার লঙ্ঘন** হেপাজতি সহিংসতা সরাসরি সংবিধান প্রদত্ত জীবন, মর্যাদা এবং নির্যাতনের বিরুদ্ধে সুরক্ষার মতো **মৌলিক অধিকার** লঙ্ঘন করে। এটি মৌলিক মানবিক মূল্যবোধ এবং সাংবিধানিক নৈতিকতা রক্ষায় রাষ্ট্রের ব্যর্থতাকেই প্রতিফলিত করে।

২. **আস্থার সংকট** যখন পুলিশ ক্ষমতার অপব্যবহার করে, তখন মানুষ সুরক্ষার বদলে পুলিশকে ভয় পেতে শুরু করে। এটি পুলিশ এবং বিচার বিভাগ—উভয়ের ওপরই জনগণের **বিশ্বাস হ্রাস** করে এবং বিচার ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

৩. **বিচারের অবমাননা** নির্যাতনের মুখে অনেক সময় অভিযুক্ত ব্যক্তি কেবল যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে **মিথ্যা স্বীকারোক্তি** দিতে বাধ্য হন। এর ফলে প্রকৃত অপরাধীরা পার পেয়ে যায় এবং নির্দোষ মানুষ শাস্তি পায়।

৪. **আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি** হেপাজতি সহিংসতার ঘনঘন ঘটনা মানবাধিকারের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একটি গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে ভারতের মর্যাদাকে বিশ্ব দরবারে ক্ষুণ্ণ করে। এটি বিশেষ করে **জাতিসংঘের নির্যাতন বিরোধী সনদের** (UN Convention Against Torture) প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতির বিষয়ে বিশ্বব্যাপী উদ্বেগ তৈরি করে।

হেপাজতি সহিংসতা মোকাবিলায় চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **সংস্কারের দুর্বল বাস্তবায়ন: প্রকাশ সিং বনাম ভারত ইউনিয়ন** মামলায় সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও অনেক রাজ্য পুলিশ সংস্কার পুরোপুরি বাস্তবায়ন করেনি। এর ফলে পুলিশি ব্যবস্থায় ক্রমাগত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং জবাবদিহিতার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

২. **প্রশিক্ষণ এবং ফরেনসিক সক্ষমতার অভাব:** বৈজ্ঞানিক তদন্ত কৌশলে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ না থাকায় পুলিশ প্রায়ই সেকেলে জিজ্ঞাসাবাদ পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে। সীমিত **ফরেনসিক অবকাঠামো** প্রমাণ-ভিত্তিক পুলিশিংয়ের পরিবর্তে বলপ্রয়োগের ওপর নির্ভরশীলতাকে আরও বাড়িয়ে দেয়।

৩. **সিসিটিভি-র মতো সুরক্ষা কবচের দুর্বল প্রয়োগ:** যদিও আদালত থানাগুলোতে **সিসিটিভি** (CCTV) স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছে, তবুও এর বাস্তবায়ন অনেক ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ বা অকার্যকর রয়ে গেছে। এটি স্বচ্ছতা কমায় এবং হেপাজতি নির্যাতনের ঘটনাগুলো প্রমাণ করা কঠিন করে তোলে।

৪. **বিচারবিভাগীয় বিলম্ব এবং সাক্ষীদের ভয় দেখানো:** ধীরগতির আইনি প্রক্রিয়া বিচার পেতে দেরি করে, যা হেপাজতি সহিংসতার বিরুদ্ধে শাস্তির ভয়কে কমিয়ে দেয়। এছাড়া, ভুক্তভোগী এবং সাক্ষীরা প্রায়ই হুমকির সম্মুখীন হন, যা তাদের সাক্ষ্য দিতে নিরুৎসাহিত করে এবং মামলার ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়।

হেপাজতি সহিংসতা নিয়ে বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

১. **জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত আন্তর্জাতিক মানদণ্ড:** জাতিসংঘ নির্যাতন প্রতিরোধ এবং হেপাজতে থাকা ব্যক্তিদের সুরক্ষার জন্য বৈশ্বিক মানবাধিকার মানদণ্ড তৈরি করেছে। অনেক দেশ বন্দিদের সাথে মানবিক আচরণ নিশ্চিত করতে তাদের অভ্যন্তরীণ আইনগুলোকে এই মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করেছে।

২. **ইউনাইটেড নেশনস কনভেনশন এগেইনস্ট টর্চার (UNCAT) কাঠামো:** UNCAT নির্যাতন নিষিদ্ধ করার জন্য একটি আইনি কাঠামো প্রদান করে এবং অপরাধীদের কঠোর শাস্তির নির্দেশ দেয়। **যুক্তরাজ্য** এবং **ফ্রান্সের** মতো দেশগুলো UNCAT-এর সাথে সংগতি রেখে তাদের আইনি ব্যবস্থায় নির্যাতন-বিরোধী বিধান অন্তর্ভুক্ত করেছে।

৩. **উন্নত গণতান্ত্রিক দেশগুলোর অনুশীলন:** উন্নত দেশগুলো পুলিশি ব্যবস্থায় জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা এবং প্রযুক্তির ওপর গুরুত্ব দেয়:

- **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র:** বলপ্রয়োগ রোধে বডি ক্যামেরা, মিরান্ডা রাইটস (গ্রেপ্তারের সময় অধিকার জানানো) এবং শক্তিশালী বিচারবিভাগীয় তদারকি ব্যবহার করা হয়।
- **যুক্তরাজ্য:** 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফিস ফর পুলিশ কন্ডাক্ট'-এর মতো স্বাধীন সংস্থাগুলো পুলিশের অপেশাদার আচরণ তদন্ত করে।
- **জাপান:** স্বীকারোক্তি নিয়ন্ত্রণ, জিজ্ঞাসাবাদের ভিডিও রেকর্ডিং এবং কঠোর পদ্ধতিগত সুরক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়।

ভবিষ্যৎ পথ

১. **পুলিশ সংস্কার:** রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ কমাতে **প্রকাশ সিং বনাম ভারত ইউনিয়ন** মামলার সংস্কারগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে। তদন্তের কাজকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব থেকে আলাদা করলে পেশাদারিত্ব ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

২. **আইনি সংস্কার:** একটি নির্দিষ্ট **নির্যাতন-বিরোধী আইন** হেপাজতি সহিংসতাকে স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত এবং শাস্তিযোগ্য করবে। **জাতিসংঘের নির্যাতন বিরোধী সনদ (UNCAT)** অনুমোদন করলে ভারত বৈশ্বিক মানদণ্ডের সাথে একাত্ম হতে পারবে।

৩. **প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা: সিসিটিভি** এবং **বডি ক্যামেরা** স্বচ্ছতা বাড়ায় এবং ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে বাধা হিসেবে কাজ করে। এগুলো অভিযোগের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য প্রমাণও সরবরাহ করে।

৪. **তদারকি শক্তিশালী করা:** স্বাধীন অভিযোগ কর্তৃপক্ষ পুলিশের অপেশাদার আচরণের নিরপেক্ষ তদন্ত নিশ্চিত করতে পারে। **জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (NHRC)**-এর মতো সংস্থাগুলোকে আরও ক্ষমতাশালী করলে জবাবদিহিতা বাড়বে।

৫. **বিচারবিভাগীয় সতর্কতা:** অপব্যবহার রোধে আদালতকে গ্রেপ্তার এবং রিমান্ডের প্রক্রিয়াগুলো নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করতে হবে। অবহেলাকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা শাস্তির ভয়কে আরও জোরদার করবে।

৬. **সক্ষমতা বৃদ্ধি:** বৈশ্বিক মানদণ্ড অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক তদন্তের প্রশিক্ষণ বলপ্রয়োগের ওপর নির্ভরতা কমায়। **মানবাধিকার সচেতনতা** বৃদ্ধি করলে পুলিশি ব্যবস্থায় নৈতিকতা ও মানবিক আচরণ উৎসাহিত হবে।

৭. **কমিউনিটি পুলিশিং:** পুলিশ ও নাগরিকদের মধ্যে বিশ্বাস তৈরি করলে সহযোগিতা এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায়। এটি পুলিশিংকে 'বলপ্রয়োগ-ভিত্তিক' পদ্ধতি থেকে 'সেবা-ভিত্তিক' পদ্ধতিতে রূপান্তর করে।

উপসংহার

হেপাজতি সহিংসতা কেবল আইন প্রয়োগের ব্যর্থতা নয়, বরং এটি **সাংবিধানিক নৈতিকতার** এক গভীর সংকট; যেখানে রাষ্ট্র রক্ষকের পরিবর্তে অধিকার হরণকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে। **সাথানকুলাম হেপাজতি মৃত্যু মামলা** দেখায় যে, প্রতিষ্ঠানগুলো সাহস ও সততার সাথে কাজ করলে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব। তবে এমন মুহূর্তগুলো ব্যতিক্রম নয়, বরং নিয়মে পরিণত হওয়া উচিত।

ভারতকে অবশ্যই একটি মানবিক এবং **অধিকার-ভিত্তিক পুলিশিং মডেলের** দিকে অগ্রসর হতে হবে, যেখানে ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করা হবে, স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে এবং মর্যাদা ও ন্যায়বিচার প্রকৃত অর্থে প্রতিষ্ঠিত হবে।

Q. Custodial violence is a relic of colonial policing that continues to undermine the constitutional morality of modern India. In light of recent judicial developments, discuss the systemic challenges in eradicating custodial torture and suggest comprehensive reforms to transition from 'force-based' to 'rights-based' policing. 15 Marks

***

সাধারণ অধ্যয়ন ৩

2.1. অর্থনীতি

2.1.1. ভারতের টেক্সটাইল খাতের অগ্রগতিতে তাপপ্রবাহের সংকট

ভূমিকা

- **বাংলাদেশ** সহ অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী উৎপাদন কেন্দ্রগুলোতে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে আন্তর্জাতিক ক্রেতারা ভারতের দিকে ঝুঁকছেন। ফলে ভারতের **টেক্সটাইল খাতে** বর্তমানে একটি **ঐতিহাসিক উত্থান** লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং **'মেক ইন ইন্ডিয়া'** (Make in India) উদ্যোগের অধীনে ভারত বিশ্বের অন্যতম পছন্দের উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে।
- তবে এই জোয়ার এখন এক কঠোর **জৈবিক ও যান্ত্রিক বাস্তবতার** সম্মুখীন হচ্ছে: তা হলো চরম **তাপজনিত চাপ** (Heat Stress)। এই সংকট নীরবে শ্রমিকের **উৎপাদনশীলতা**, কারখানার আউটপুট এবং দীর্ঘমেয়াদী **শিল্প প্রতিযোগিতা সক্ষমতাকে** পঙ্গু করে দিচ্ছে।

ভারতের টেক্সটাইল শিল্পের সংক্ষিপ্ত চিত্র

ভারতের টেক্সটাইল খাত অর্থনীতির একটি অন্যতম **ভিত্তিপ্রস্তর**, যা **কৃষি এবং শিল্পায়নের** মধ্যে একটি যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে। নিচে দেওয়া তথ্যের মাধ্যমে এই খাতের ব্যপ্তি বোঝা সম্ভব:

- **অর্থনৈতিক অবদান এবং জিডিপি-তে অংশ:**
  - এই শিল্প ভারতের **জিডিপি** (GDP)-তে প্রায় **২.৩%** অবদান রাখে, মোট **শিল্প উৎপাদনের ১৩%** দখল করে এবং জাতীয় রপ্তানির **১২%** জোগান দেয়।
  - ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ভারত **৩৪.৪ বিলিয়ন ডলার** মূল্যের বস্ত্রসামগ্রী রপ্তানি করেছে, যার মধ্যে ৪২% ছিল তৈরি পোশাক বা **অ্যাপারেল** (Apparel)।
- **বিশ্ব দরবারে অবস্থান এবং উৎপাদন ক্ষমতা:**
  - ভারত বর্তমানে বিশ্বের **ষষ্ঠ বৃহত্তম টেক্সটাইল ও পোশাক রপ্তানিকারক** এবং তুলা ও রেশম উৎপাদনে ও ব্যবহারে বিশ্বের **দ্বিতীয় বৃহত্তম** দেশ।
  - ভারত বিশ্বের একমাত্র দেশ যেখানে **চার ধরনের বাণিজ্যিক রেশম** (মালবেরি, তসর, মুগা এবং এরি) উৎপাদিত হয়। ২০২৩-২৪ সালে মোট **৩৮,৯১৩ মেট্রিক টন** রেশম উৎপাদিত হয়েছে।
- **কর্মসংস্থান এবং বাজারের পরিধি:**
  - কৃষির পর এটি ভারতের **দ্বিতীয় বৃহত্তম কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী** খাত, যা **৪৫ মিলিয়নেরও বেশি** মানুষের সরাসরি জীবিকা নির্বাহ করে। এর মধ্যে একটি বড় অংশ হলো **নারী এবং গ্রামীণ জনসংখ্যা**।
  - বর্তমান **১৭৪ বিলিয়ন ডলার** থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে এই বাজারের আকার **৩৫০ বিলিয়ন ডলারে** পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
- **ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের** (MSME) **ভূমিকা:**
  - এই শিল্পের মোট ক্ষমতার প্রায় **৮০%** অংশই ছড়িয়ে রয়েছে **এমএসএমই** (MSME) ক্লাস্টারগুলোতে, যা এই খাতের **অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রকৃতিকে** (Inclusive Nature) প্রতিফলিত করে।
- **বিশ্বব্যাপী প্রদর্শনী:**

- **ভারত টেক্স** (Bharat Tex) ২০২৪-এর মতো আয়োজনগুলো ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরেছে। ১২০টিরও বেশি দেশ থেকে ১,২০,০০০-এর বেশি দর্শনার্থী এতে অংশ নেন, যেখানে **'খামার থেকে ফ্যাশন'** (Farm to Fashion) পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভ্যালু চেইন প্রদর্শিত হয়েছে।

ভারতের টেক্সটাইল শিল্পের গুরুত্ব

টেক্সটাইল শিল্প কেবল একটি বাণিজ্যিক খাত নয়, বরং ভারতের **আর্থ-সামাজিক রূপান্তরের** একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার:

- **কর্মসংস্থানের চালিকাশক্তি:** টেক্সটাইল শিল্প **অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির** একটি শক্তিশালী ইঞ্জিন হিসেবে কাজ করে। এটি গ্রামীণ যুবক, নারী এবং **এমএসএমই** (MSME) খাতের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। পাশাপাশি তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটের মতো রাজ্যগুলোতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং আঞ্চলিক উন্নয়নে নেতৃত্ব দেয়।
- **রপ্তানি আয় ও বৈদেশিক মুদ্রা:** এটি ভারতের রপ্তানি ঝুড়িতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে এবং দেশের **বৈদেশিক বাণিজ্য খাতকে** (External Sector) শক্তিশালী করে।
- **MSME-এর মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি:** এই শিল্পে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (MSME) আধিপত্য শিল্পায়নের আঞ্চলিক বিস্তার এবং **সুষম উন্নয়ন** নিশ্চিত করে।
- **কৃষির সাথে সংযোগ:** এটি তুলা, রেশম এবং পাট উৎপাদনের সাথে যুক্ত কৃষকদের সহায়তা করে এবং তাদের **আয়ের বৈচিত্র্য** নিশ্চিত করে।
- **বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে কৌশলগত ভূমিকা:** ভারত বিশ্বজুড়ে একটি নির্ভরযোগ্য বিকল্প উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে, যা দেশের **ভূ-রাজনৈতিক** ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি করছে।
- **জাতীয় মিশনের সাথে সংহতি:** এই খাতটি **"মেক ইন ইন্ডিয়া," "স্কিল ইন্ডিয়া" এবং "অটল ইনোভেশন"** মিশনের সাথে নিখুঁতভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা দেশীয় উৎপাদন উৎকর্ষের একটি পরীক্ষাগার হিসেবে কাজ করছে।

ভারতের টেক্সটাইল শিল্পের চ্যালেঞ্জসমূহ

প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা সত্ত্বেও, একটি **"যান্ত্রিক এবং জৈবিক বাস্তবতা"** ভারতের শিল্পাঞ্চলগুলোকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। বাংলাদেশের মতো অস্থির কেন্দ্রগুলো থেকে সরে আসা আন্তর্জাতিক অর্ডারের জোয়ার এখন **চরম তাপপ্রবাহের** বাধার মুখে পড়ছে।

১. **তাপজনিত চাপ এবং উৎপাদনশীলতা হ্রাস (মূল সমস্যা):**

- চরম তাপ মানবশ্রমের সক্ষমতাকে কমিয়ে দিচ্ছে, যা সরাসরি **উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতাকে** প্রভাবিত করছে।
- বৈজ্ঞানিক প্রমাণ অনুসারে, তাপমাত্রা **৩৩–৩৪°C** পৌঁছালে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা প্রায় **৫০% হ্রাস পায়**, কারণ শরীরকে অতিরিক্ত গরম হওয়া থেকে বাঁচাতে মানুষ শারীরিক পরিশ্রম কমিয়ে দেয়।
- ভারতের অনেক টেক্সটাইল ইউনিটে ইনডোর তাপমাত্রা প্রায়ই **৩৫–৪০°C** ছাড়িয়ে যায়, যা নিরাপদ কর্মপরিবেশের সীমার অনেক উপরে।
- **আর্থিক ক্ষতি:** ২০০১-২০২০ সালের মধ্যে তাপজনিত চাপের কারণে ভারত বার্ষিক প্রায় **২৫৯ বিলিয়ন কর্মঘণ্টা** হারিয়েছে, যার আর্থিক মূল্য বছরে প্রায় **৬০০ বিলিয়ন ডলার**।
- ২০৩০ সালের মধ্যে ভারত তার মোট কর্মঘণ্টার **৫.৮%** হারাতে পারে, যা **৩৪ মিলিয়ন পূর্ণকালীন কর্মসংস্থানের** সমান।

২. **শ্রমিকদের ওপর প্রভাব (মানবিক মূল্য):**

- অনানুষ্ঠানিক ও স্বল্প আয়ের শ্রমিকরা এই তাপের বোঝা সরাসরি বহন করে। এর ফলে তাদের উৎপাদনশীলতা কমার সাথে সাথে **মজুরি হ্রাস** পায়।

- শীতলীকরণ বিরতি (Cooling breaks), সবেতন অসুস্থতাজনিত ছুটি বা সামাজিক নিরাপত্তার অভাব তাদের আরও ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে।
- **স্বাস্থ্য ঝুঁকি:** হিটস্ট্রোক, ডিহাইড্রেশন, দীর্ঘস্থায়ী ক্লান্তি এবং কিডনিজনিত জটিল রোগের ঝুঁকি প্রবল। এটি মূলত দরিদ্রদের ওপর একটি **"বৈষম্যমূলক কর" (Regressive Tax)** হিসেবে কাজ করে।

৩. **শিল্প ও উৎপাদন বিঘ্নিত হওয়া:**

- চরম তাপের কারণে উৎপাদন ক্ষমতা **৫০% পর্যন্ত হ্রাস** পেতে পারে এবং অনিরাপদ পরিবেশের কারণে কাজের সময় দৈনিক মাত্র **৪-৫ ঘণ্টায়** নেমে আসে।
- অতিরিক্ত তাপের কারণে **যন্ত্রপাতি বিকল** হওয়া এবং প্রযুক্তিগত ত্রুটি উৎপাদন চক্রকে ব্যাহত করে, ফলে আন্তর্জাতিক ডেলিভারি সময়মতো সম্পন্ন করা কঠিন হয়ে পড়ে।

৪. **সরবরাহ শৃঙ্খলের চাপ এবং বৈশ্বিক বৈষম্য:**

- আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলো সময়মতো পণ্য সরবরাহে ব্যর্থ হলে কারখানা মালিকদের ওপর **ভারী জরিমানা** আরোপ করে।
- মালিকরা তখন বাধ্য হয়ে শ্রমিকদের শারীরিক সীমার বাইরে কাজ করান অথবা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন। বৈশ্বিক ব্র্যান্ডগুলো অনেক সময় ঝুঁকি এড়াতে অর্ডার ভিয়েতনাম বা মেক্সিকোতে সরিয়ে নেয়, কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের **অভিযোজন খরচ (Adaptation cost)** ভাগ করে নিতে চায় না।

৫. **জলবায়ু পরিবর্তন: একটি কাঠামোগত অর্থনৈতিক ঝুঁকি:**

- তাপজনিত চাপ এখন আর কোনও সাময়িক সমস্যা নয়; এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী **কাঠামোগত বাধা**। একে **"থার্মোডাইনামিক বটলেনেক"** বা তাপগতিবিদ্যার বাধা বলা হচ্ছে।
- গবেষণা দেখায় যে, তাপমাত্রা প্রতি **১°C বৃদ্ধিতে** বার্ষিক অর্থনৈতিক উৎপাদন **২% হ্রাস** পায়।

৬. **আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা:**

- বিশেষ করে এমএসএমই (MSME) গুলোর শীতলীকরণ পরিকাঠামো বা তাপ-প্রতিরোধী প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করার মতো **মূলধনের অভাব** রয়েছে।
- আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণ দেওয়ার সময় জলবায়ু ঝুঁকিকে সঠিকভাবে বিবেচনা করে না, যা এই খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগকে সীমিত করছে।

৭. **শ্রম ও নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার ঘাটতি:**

- ভারতের বর্তমান শ্রম আইন তাপজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় পর্যাপ্ত নয়। কর্মক্ষেত্রে নির্দিষ্ট **তাপমাত্রা সীমা**, বাধ্যতামূলক বিরতি এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের গ্যারান্টিযুক্ত আইনি বিধানের অভাব রয়েছে।

টেক্সটাইল আধুনিকায়নে প্রধান সরকারি উদ্যোগসমূহ

ভারত সরকার টেক্সটাইল খাতের আধুনিকীকরণ এবং এর কাঠামোগত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করার জন্য বেশ কিছু ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প চালু করেছে:

- **PM MITRA (মেগা ইন্টিগ্রেটেড টেক্সটাইল রিজিয়ন অ্যান্ড অ্যাপারেল) পার্ক:** ৪,৪৪৫ কোটি টাকা বাজেটের এই প্রকল্পের অধীনে সাতটি পার্ক স্থাপন করা হচ্ছে। এর লক্ষ্য হলো **সমন্বিত শিল্প পরিকাঠামো** প্রদান করা, লজিস্টিক খরচ কমানো এবং **সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI)** বৃদ্ধি করা।
- **উৎপাদন ভিত্তিক প্রণোদনা (PLI) স্কিম:** ১০,৬৮৩ কোটি টাকা বরাদ্দের এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো **ম্যান-মেড ফাইবার (MMF)** এবং **টেকনিক্যাল টেক্সটাইল** উৎপাদনে ভারতের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

- **প্রযুক্তি এবং দক্ষতা উন্নয়ন:**
  - **ATUFS (অ্যামেন্ডেড টেকনোলজি আপগ্রেডেশন ফান্ড স্কিম):** ১৭,৮২২ কোটি টাকার এই বাজেট এমএসএমই (MSME) খাতের প্রযুক্তিগত আধুনিকীকরণে মূলধনী বিনিয়োগে সহায়তা করে।
  - **সমর্থ (Samarth) স্কিম:** এটি দক্ষতা প্রশিক্ষণের ওপর আলোকপাত করে। ইতিমধ্যে ৩.৮২ লাখেরও বেশি মানুষকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং এর **কর্মসংস্থানের হার (Placement rate)** প্রায় ৭৭%।
- **খাত-ভিত্তিক মিশনসমূহ:**
  - **জাতীয় টেকনিক্যাল টেক্সটাইল মিশন (NTTM):** ১,৪৮০ কোটি টাকার এই মিশনের লক্ষ্য ভারতকে হাই-টেক স্পেশালিটি ফাইবারে বিশ্বসেরা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।
  - **কস্তুরী কটন ভারত: ব্লকচেইন প্রযুক্তির** মাধ্যমে ভারতীয় তুলার ব্র্যান্ডিং এবং এর উৎস চিহ্নিতকরণ (Traceability) নিশ্চিত করার একটি প্রোগ্রাম।
  - **সিল্ক সমগ্র এবং জুট-আইসিএআরই (Jute-ICARE):** গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে রেশম ও পাটের গুণমান ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য নিবেদিত প্রকল্প।
- **বাণিজ্য চুক্তি:** অতিরিক্ত ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে RoSCTL (রাজ্য ও কেন্দ্রীয় কর এবং শুল্ক মকুব) সুবিধা এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত ও অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশগুলোর সাথে **১৪টি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA)**, যা ভারতীয় বস্ত্রের জন্য শুল্কমুক্ত বাজারে প্রবেশের সুযোগ করে দেয়।
- **বাজেট বরাদ্দ:** ২০২৫-২৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে টেক্সটাইল মন্ত্রকের জন্য ৫,২৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে (১৯% বৃদ্ধি)। এতে শাটল-লেস লুমের ওপর শুল্ক ছাড় এবং সস্তা আমদানি রুখতে নিটেড কাপড়ের ওপর **কাস্টমস শুল্ক বৃদ্ধি** অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ভবিষ্যতের পথনির্দেশিকা: জলবায়ু-স্মার্ট সরবরাহ শৃঙ্খলে রূপান্তর

দীর্ঘমেয়াদী প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে ভারতকে শ্রম-শোষণকারী উৎপাদন মডেল থেকে সরে এসে একটি **জলবায়ু-সহনশীল (Climate-resilient)** এবং **শ্রমিক-কেন্দ্রিক** মডেল গ্রহণ করতে হবে। এর জন্য একটি পদ্ধতিগত রূপান্তর প্রয়োজন:

- **তাপজনিত চাপকে অর্থনৈতিক ঝুঁকি হিসেবে স্বীকৃতি:** তাপজনিত চাপকে একটি প্রধান অর্থনৈতিক এবং সরবরাহ শৃঙ্খলের ঝুঁকি হিসেবে বিবেচনা করতে হবে এবং একে **শিল্প নীতি** ও রপ্তানি কৌশলের অবিচ্ছেদ্য অংশ করতে হবে।
- **বাধ্যতামূলক হিট অ্যাকশন প্ল্যান:** শিল্প ইউনিটগুলোতে নির্দিষ্ট **তাপমাত্রা সীমা (প্রায় ৩০°C)**, শীতলীকরণ বিরতি এবং নমনীয় শিফট চালু করতে হবে। এটি রিয়েল-টাইম হিট মনিটরিং সিস্টেমের মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া উচিত।
- **জলবায়ু-সংবেদনশীল অর্থায়ন:** ব্যাংকগুলোর উচিত ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্তে জলবায়ু ঝুঁকিকে অন্তর্ভুক্ত করা। সরকারকে **শীতলীকরণ পরিকাঠামো** এবং জল-ব্যবস্থাপনার জন্য ভর্তুকিযুক্ত ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- **শ্রম সুরক্ষা কাঠামো শক্তিশালীকরণ:** শ্রম আইনে তাপজনিত চাপের স্পষ্ট বিধান থাকতে হবে, যাতে নিরাপদ কর্মপরিবেশ, পানীয় জলের সুবিধা এবং বাধ্যতামূলক বিশ্রামের বিরতি নিশ্চিত করা যায়।
- **প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের প্রচার:** বিনিয়োগের কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত **পরিধানযোগ্য শীতলীকরণ ডিভাইস (Wearable cooling devices)**, শক্তি-সাশ্রয়ী কারখানার নকশা এবং তাপ-প্রতিরোধী তুলার জাতের উদ্ভাবন।
- **বৈশ্বিক ব্র্যান্ডগুলোর দায়বদ্ধতা:** আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের উচিত ন্যায্য মূল্য প্রদান করা এবং ডেলিভারি সময়সীমার ক্ষেত্রে নমনীয় হওয়া, যাতে তারা জলবায়ু অভিযোজনের খরচ ভাগ করে নেয়।
- **জলবায়ু-সহনশীল শিল্প পরিকল্পনা:** টেকসই শিল্প প্রবৃদ্ধির জন্য **সবুজ টেক্সটাইল ক্লাস্টার (Green textile clusters)** তৈরি এবং উন্নত বায়ু চলাচল ব্যবস্থা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

- **উপাত্ত, গবেষণা এবং সহযোগিতা:** রিয়েল-টাইম তথ্য এবং গবেষণার ভিত্তিতে নীতি নির্ধারণ করতে হবে। সরকার, শিল্প এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় আরও জোরদার করতে হবে।

উপসংহার

ভারতীয় টেক্সটাইল শিল্পের **৩৫০ বিলিয়ন ডলারের** অর্থনীতিতে উন্নীত হওয়ার পথটি অবশ্যই **জলবায়ু-সহনশীল পরিকাঠামো** এবং শক্তিশালী **শ্রম সুরক্ষার** ওপর ভিত্তি করে নির্মিত হতে হবে। শ্রমিক কল্যাণ, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং বৈশ্বিক দায়বদ্ধতাকে এর প্রবৃদ্ধি কৌশলের সাথে একীভূত করার মাধ্যমে ভারত যেমন **অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি** নিশ্চিত করতে পারবে, তেমনি সুরক্ষিত করতে পারবে সেই লক্ষ লক্ষ মানুষের মঙ্গল যারা এই টেক্সটাইল স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করছেন।

Q. Climate change is emerging as a structural constraint on labor-intensive industries in India. Examine this statement in the context of the India's textile industry. 15 Marks

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

Click here to watch this video